মানবসভ্যতায় কুমারীবলি

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৮

প্রকাশক :
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
শঙ্কর দাস

মুদ্রক :
শ্রীশক্তিপদ আড়ু
নিউ মা কালী প্রিণ্টার্স
১২।১ রামচাঁদ ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই :

রক্তকরবীর লোকায়ত ভাবনা

বিবাহের লোকাচার (সম্পাদিত)

নিবেদন

ভারতবর্ষে তন্ত্র-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হলেও প্রাচীন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চলে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিচিত্র পরিবেশে কুমারীবলি হয়েছে। আজ পশু-নর-নারী অথবা কুমারীবলি বললে বুঝি শোণিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এদের কণ্ঠচ্ছেদন। যেসব দেবপূজায় এই রুধির উৎসর্গীকৃত হয়, তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বলতে শুনেছি 'জাগ্রত দেবতা'। এই ধরণের চিন্তা থেকে একটি প্রচলিত মতবাদ গড়ে উঠেছে যে মানুষের দেব-পূজার মূলে আছে অদৃশ্য বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে ভীতি। কিন্তু ভীতি-বোধ নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে আকাংক্ষা পূরণের প্রতিরূপ যার মধ্যে সে দেখেছিল, তাকেই মানুষ দেবতা বলেছিল। ভয়ের চিন্তা পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। বলি সম্বলিত পূজা-অনুষ্ঠানের মূলে কণ্ঠ-কাণ্ড নয়, ছিল নারীর যৌবন-সংকেত রুধির। সৃষ্টি-রুধির কেমন করে কণ্ঠশোণিতে রূপান্তরিত হলো তারই আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে মুখ্য। এবং সৃষ্টিকল্পনামূলক পূজা-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বহুধা হবার আকাংক্ষা কেমন করে কাজ করে চলেছে, কেমন করে সেই চিন্তা বিচিত্র অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করেছে, যথাসাধ্য সে আলোচনার পরোক্ষ-প্রসঙ্গ লেখায় এসে গেছে।

মানুষের মূল্যবোধ অথবা নীতিবোধ যুগ-পরিবেশকে সামনে রেখে চির-পরিবর্তনশীল। এক সময় যে কারণে সমাজ শাসকরা যে কঠোর বিধান দিতেন এবং সমাজ যা মাথা পেতে নিত, আজ তা করতে গেলে সমাজপতিরাই একঘরে হবেন হয়তো। মুমূর্ষুকে 'অন্তর্জলি' অথবা তুলসীতলায় শায়িত করার কথা এ যুগ ভাবতে পারে কি?

আদিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার তাগিদে যে কোনো উপায়ে হোক বংশ বৃদ্ধি করতেই হবে— অতীতের এই চিন্তাকে দূষণীয় ভাবা যায় না এইজন্য যে, আজকের নীতিবোধ সে যুগে ছিল না, তার প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। কিন্তু সমাজব্যবস্থার, তার জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে 'নিয়োগ প্রথা' এ যুগে অসামাজিক আচরণ বা চিন্তা বলে নিন্দিত। তাই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় আচার-অনুষ্ঠানেরও পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কুমারীপূজা তথা বলিকে কেন্দ্র করে এক সময়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে সমস্যার রেশ আজও রয়েছে তার প্রকৃতি নির্ণয় যথাসাধ্য উৎস-নির্দেশের সাহায্যে বর্তমান আলোচনায় করেছি।

যে পুরোহিত-সম্প্রদায় অনুষ্ঠানের রেখাচিত্র অঙ্কন করেন, তারা যদি নিজেদের বৃত্তি-চিন্তার বা সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নতুন মূল্যবোধকে স্বীকার না করেন, সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে। যুগ সমস্যা সমাধানের পথে ঐতিহ্য-নির্দিষ্ট স্রোতোহীন মানসিকতার চিন্তা পরোক্ষভাবে এমন বাধার সৃষ্টি করে যাতে সমস্ত জাতীয় জীবন কর্দমকূপে পরিণত হয়। ফলে বাস্তব জীবন এবং ঐতিহ্যগত ধ্যান ধারণার মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়—সুষ্ঠু সমাধান চিন্তার আশা হয়ে পড়ে

সুদূর-পরাহত। সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে মননশীল কর্ণধারদের সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ তাই বিশেষ প্রয়োজন।

এদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে নরহত্যা, গুরুতর অপরাধ। তবু কুমারীবলি, নরবলি এখনও চলে। কিন্তু সাধারণভাবে নরহত্যা এবং পূজার নামে, বিশেষ অলৌকিক শক্তি অর্জনের নামে যে নরমেধ চলে, তার মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। বিশেষ করে যখন দেখি মানুষ আপন পিতৃহত্যায় পর্যন্ত (অমৃতবাজার পত্রিকায় ৭লা এপ্রিল '৮১ তারিখে প্রকাশিত এই ধরণের সংবাদ দ্রষ্টব্য) কুণ্ঠিত নয়। তান্ত্রিকতার নামে যে নর-নারীঘাতন চলে তার মূলে আছে ঐতিহ্যবাহী গুরুবাদী ধর্মীয় শিক্ষা; আর তারও মূলে মানুষের অজ্ঞতা। অজ্ঞতা-প্রসূত চিন্তার বশবর্তী মানুষকে নরমেধ-যজ্ঞের চিন্তার হাত থেকে মুক্ত করতে হলে কেবলমাত্র অপরাধীকে শাস্তি দিলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না; সঙ্গে চাই এই চিরায়ত অজ্ঞতার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গঠনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা। 'হত্যা'-শব্দটির সাধনপদ্ধতিতে আদি তাৎপর্য কি ছিল, কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে, এই ধরণের অনুষ্ঠানের ক্রমবিবর্তন কেমন করে হলো এবং বর্তমানের পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে সেইসব হত্যার (কুমারীবলি, কুমারীত্ব-বলি, নর বা পশু-শোণিতে দেবতার তৃপ্তিসাধন অকাংক্ষাজনিত হত্যা)। কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা, এ-সবই দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। দেবচিন্তা তথা লৌকিক বা অলৌকিক সম্পদচিন্তার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানগুলি কেমন করে যুক্ত হয়েছিল, কেনই বা গৌরীগডনের মত অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে চলতো, কেনই-বা তার ভগ্ন অংশ বিভিন্ন ধরণের উপাসনা-চিন্তার সঙ্গে আজও যুক্ত হয়ে আছে, তা থেকে সমাজ কি পাচ্ছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়-পাঠ্যসূচিতে যেমন শারীরবিদ্যা (Physiology) যুক্ত হয়েছে, তেমনি দূর-দূরান্তরের গ্রাম-বাসীদের সঙ্গে শহরাঞ্চলেও ব্যাপক জনশিক্ষা-প্রকল্প গড়ে তোলা আশু কর্তব্য। সাক্ষরতা প্রসার যেমন প্রয়োজন তেমনি লৌকিক গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়ে স্পষ্ট বলিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে এগোতে পারলে পরিবার কল্যাণ-পরিকল্পনা যেমন সার্থক হতে পারে, তেমনি নারীমনের পুঞ্জীভূত সংস্কারের বোঝাকে হালকা করে তাদের এবং একই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম বক্তব্য এটিও।

তন্ত্র এক বিশেষ পদ্ধতির ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান। এই ধরণের অনুষ্ঠান যে কেবল ভারতবর্ষ বা চীন-তিব্বতেই অনুষ্ঠিত হতো বা হয়, তা-ই নয়, দেবপূজার নামে কুমারীকে বলি দেওয়া, তার কুমারীত্ব হরণ, তাকে দেবদাসী বা উচ্চবর্ণের তথা অভিজাত শ্রেণীর সেবাদাসী করে রাখা বা তাদের দিয়ে গণিকাবৃত্তি করানো—এ চিত্র এককালের পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই পাই। তবু

'তন্ত্র'-এই বিশেষ আখ্যাটি কেবল মূলত ভারত-চীন-তিব্বত বা তৎসন্নিহিত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে।

কুমারী সম্পর্কিত দিক যেমন তন্ত্র-সাধনার সঙ্গে যুক্ত অন্যদিকে মারণ উচাটন বশীকরণ—এরাও তেমনি। এগুলোও ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠান; সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ধরণের মন্ত্র, যার কিছু অংশ আধুনিক বিচারে অশ্লীল, কিছু দুর্বোধ্য বা অবোধ্য। এগুলো বিভিন্ন অপ অথবা উপদেবতার পূজায় ব্যবহৃত। এই ধরণের অনুষ্ঠান সেদিন পর্যন্তও ইউরোপে ছিল; নাম Witchcraft। এদেশে ডাকিনী (হাকিনী, লাকিনী) বিদ্যা ছিল। অপদেবতার আহ্বান বা বিতাড়ন এক সময়ে ইওরোপে চলতো witchcraft-এর সাহায্যে; এখন exorcist-এর দ্বারা (আমাদের দেশে ওঝা)। উদাহরণস্বরূপ ১১২ সংখ্যক পাদটীকার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি। মূলে witchcraft, exorcist বা ওঝার কাজ একই ছিল। এর জন্য যে মন্ত্র ব্যবহৃত হতো তা তন্ত্রের মন্ত্রের মত anthem নামে অভিহিত হতে পারে (শব্দার্থের উৎকর্ষহেতু এই প্রয়োগ খারাপ লাগতে পারে)।

তন্ত্র-প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর tantrum শব্দটিকে। তন্ত্র এবং tantrum যে, মূলে একই ছিল তার কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে। প্রথমত, তন্ত্রের ক্রিয়ামূলক সাধনপদ্ধতিতে মানুষের এক বিশেষ ধরণের জৈব-প্রবৃত্তির (passion) উত্তেজনা-সাধন করা হয়। এই উত্তেজনাকে সাধক, তন্ত্রের পরিভাষায় 'পরিশীলিত' করে পশু থেকে বীর, বীর থেকে দিব্য ভাবের পথে টেনে নিয়ে যান। তবু বীরভাবের সাধনাকেই শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধনা বলা হয়েছে (এর ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য ১৯২ সংখ্যক পাদটীকার পর * চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)। বীরাচারী সাধনার পথের সঙ্গে tantrum-এর অর্থের—display of petulence (manifesting perversity), a fit of passion-এর আদিম ভঙ্গিতের মিল আছে। বীরভাবের সাধনা সাধকের কাছে শ্রেষ্ঠ হলেও আধুনিক মনের কাছে perversity ছাড়া অন্য কি হতে পারে? দ্বিতীয়ত, তন্ত্রের বিভিন্ন পন্থায় ক্রিয়ার সঙ্গে মন্ত্রও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। অক্সফোর্ড অভিধানে পূর্ববর্তী সংজ্ঞার সঙ্গে আরও উল্লেখ আছে: In Willis's Room for Cobbler of Gloucester 1663 tantrum appears as a Welshman's mispronounciation of anthem···। আপাতদৃষ্টিতে tantrum এবং anthem-এর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হলেও, তান্ত্রিক মারণ উচাটন বশীকরণ প্রক্রিয়ায় মন্ত্র উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং আচরণ, ওঝাদের ক্রিয়াকলাপ, exorcist-দের কার্যধারা, witchcraft-এর

করণীয় ইত্যাদির মধ্যে anthem এবং tantrum এই দুয়ের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়। অর্থাৎ, tantrum-এর মূলগত অর্থের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার প্রক্রিয়া-গত বিভিন্ন দিকের মিল আছে। তৃতীয়ত, tantrum এবং তন্ত্রম্ উচ্চারণগত দিক থেকে অভিন্ন, মূলে এরা একই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে—আমার এই চিন্তার ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তন্ত্রই হোক, আর অন্য ধরণের সাধনা বা ক্রিয়াকলাপই হোক, বহুকাল-প্রচলিত একটি বিশেষ রীতি সমাজ-মানসিকতার উপর যে গভীর ছাপ রাখে, তার চিত্ররূপ পরিবর্তন সহজ নয়। এর জন্য চাই মননশীল বিচার বিশ্লেষণ, গভীরভাবে অনুধাবনের সাহায্যে তার মর্মমূলে প্রবেশ করে স্বরূপ আবিষ্কার। তখনই কেবল অভ্যস্ত মানুষের সামনে আদি-তাৎপর্য উপস্থাপিত করা সম্ভব। বর্তমান গ্রন্থে কুমারীবলি ও কুমারীপূজা প্রসঙ্গে তারই প্রয়াস। সার্থক কতখানি হতে পেরেছি তার বিচার করবেন সুধী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন, মননশীল পাঠকবর্গ।

এ গ্রন্থ-রচনায় যারা আমায় নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান, আমার পিতৃকল্প অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, মদীয় পিতৃদেব আজীবন শিক্ষাব্রতী ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার। এরপরই নাম করতে হয় সহকর্মী অধ্যাপক-বন্ধু তপন চক্রবর্তীর। লোক লৌকিক-এ গ্রন্থের একটা বিরাট অংশ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হবার পর তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ইনি কয়েকটি দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন, চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিশপ 'দুবইজ' এই উচ্চারণটি সম্পর্কে বলেন, ওটি 'দুবোয়া'। দ্বাবিংশ পৃষ্ঠায় কেদারনাথের মূর্তিকে আমি বলেছি পুরুষাঙ্গের আকৃতিবিশিষ্ট। উনি আমায় বলেছেন: 'পাবকেশ্বর নামে আখ্যাত কেদারনাথের আকৃতি লিঙ্গরূপী নয়, ত্রিকোণ যূপাকৃতি'। তন্ত্রসাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে; লিখিতভাবে বহু তথ্যও আমায় দিয়েছেন। গ্রন্থ-রচনায় সেগুলি কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়েছি। আমার সহকর্মীবন্ধু ড. দুলাল চৌধুরী, ড. পল্লব সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ড. সুহৃদ ভৌমিক, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, অরুণ রায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়—এঁদের উৎসাহ আমার কাজের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতার ভূমিকা নিয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ড. আদিত্য ওহদেদার, সহ-গ্রন্থাগারিক প্রদীপ চৌধুরী ও দীপক-কুমার রায় এবং গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ সম্বন্ধে সকৃতজ্ঞ-উল্লেখ না করলে মন চিরদিনই অস্বস্তিতে ভরে থাকবে। সহধর্মিণী ছবি সরকার, পুত্র দীপেন্দ্র, বন্ধুবর বাদল ঘোষ আমার নীরব অনুপ্রেরণা। অনুজকল্পা মায়া ভট্টাচার্যের উৎসাহ কারো চেয়ে কম পাইনি।

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

'মানবসভ্যতায় কুমারীবলি' যখন লিখেছিলাম তখন ভয় ছিল আমার বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত সুধী পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম, প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই বই নিঃশেষ হয়ে গেল। অথচ তার পরেও বিভিন্ন আগ্রহী পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে লাগল বইয়ের জন্য। নানারকম অসুবিধার জন্য এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল না।

এছাড়া আরও একটি প্রধান সমস্যা ছিল লেখক হিসাবে আমার নিজের দিক থেকেও। 'গোত্রহত্যা'র বহু সাহিত্যিক এবং মূর্তিগত রূপের উদাহরণ দিলেও অনুষ্ঠানের কোনো বিবরণ বা বাস্তবে গোত্রহত্যার জন্য কোনো মূর্তি ব্যবহৃত হতো কিনা আমাদের দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, তার বিবরণ পাচ্ছিলাম না কোথাও। মাত্র কয়েকদিন আগে মূর্তি ও অনুষ্ঠানের কথা পড়লাম 'যুগান্তরে'র পাতায়। ফলে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম পরোক্ষ-প্রসঙ্গের বিশ্লেষণে, এবার তাকেই, অর্থাৎ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণায় আর বাধা রইল না।

১৩৮৮ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, তাদের কোনটিরই পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে, এমন চিন্তা করার কোনো কারণ ঘটেনি। তাই কোনো সিদ্ধান্তেরই পরিবর্তন সাধন না করে বরং তাদের সমর্থনে বেশ কিছুসংখ্যক নতুন তথ্যের সমাবেশ ঘটাতে পেরেছি।

সর্পের সঙ্গে মানবীর বিবাহ প্রসঙ্গ গল্প বা উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত করেছি। বাস্তবেও এ ধরণের বিবাহ হয়; বলেছেন J. G. Frazer তাঁর The Golden Bough গ্রন্থের ১৯১ পৃষ্ঠায়।—

The Akikuyu of British East Africa worship the snake of a certain river, and at intervals of several years they marry the snake-god to women, but especially to young girls. For this purpose huts are built by order of the medicine men, who there consummate the sacred marriage with the credulous female devotees. If the girls do not repair to the huts of their own accord in sufficient members, they are seized and dragged thither to the embraces of the duty. The affspring of these mystic unions appears to be fathered on God (Ngai [=নাগ?];…

এ ছাড়া, কুমারীত্ব তথা কোমার্য বলতে আমরা সত্যিকারের কি বুঝি বা বোঝাতে চাই সে সম্বন্ধে সম্ভবত আমাদের নিজেদেরই ধারণা খুব স্পষ্ট নয় বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ, বিভিন্নভাবে একে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুমারীত্ব তথা কোমার্য-এর প্রকৃত তাৎপর্য তরুণ তরুণী সমেত প্রকৃতি-জগতের বিভিন্ন প্রাণী বা বস্তুতে 'সৃষ্টির ক্ষমতা'। মানব-মানবী সমেত বিভিন্ন প্রাণী এবং

মৃত্তিকাতে এ ক্ষমতা একবার সন্তান ধারণ যা সৃষ্টিতেই নষ্ট হয়ে যায় না। তা ফিরে ফিরে আসে একটা বিশেষ বয়স বা সময়সীমা পর্যন্ত। এই সত্য প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরাণ কাহিনীর ঋষি অথবা দেবতাদের কুমারী কন্যাদের সঙ্গে মিলনাকাংক্ষার মুহূর্তে। আমার এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনের জন্য আমেরিকার ওহিও থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'অতলান্তিক'-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটির বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে, বর্তমান সংস্করণে সপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি।

মূলত অনুসন্ধিৎসু রসজ্ঞ পাঠকের এ ব্যাপারে কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য কিছু নতুন তথ্যে বর্তমান সংস্করণকে সাজালাম। তবু এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, পূর্ববর্তী সংস্করণের মূল কাঠামো বর্তমান সংস্করণেও থেকে গেল।

'পুস্তক বিপণি'র স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে না এলে এ সংস্করণ প্রকাশেও বিলম্ব ঘটতো, একথা বলাই বাহুল্য। তাকে ধন্যবাদ জানাবো না।

একটি ব্যাপারে পাঠকের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আর তা হলো মুদ্রণপ্রমাদ। প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ 'কোলিঙ্গ'-এর জায়গায় 'কোলি', ৪র্থ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ পংক্তিতে প্রথম শব্দ কুমারীবলির'-এর পরে 'কথা' ৮ম পংক্তিতে 'বলি দিতে হলে'-এর পরিবর্তে 'বলি দিতে উদ্যত হলে', ৮ম পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তিতে 'দৃষ্টি'-র পরিবর্তে 'সৃষ্টি', ১৪ পৃষ্ঠার ১ম পংক্তিতে 'স্কপগোট'-এর বদলে 'স্কেপগোট', ২৫ পংক্তিতে 'আদ্রিয়ান লিস'-এর বদল 'আদ্রিয়ান লিম'-এর ৯ম পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির 'খজালি'র স্থলে 'ঘজালি,' পাদটীকার ৭ পংক্তিতে production এর বদলে prosecution, ১২ পংক্তির procutor-এর পরিবর্তে prosecutor, এবং পঞ্চদশ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তির 'egunot এর বদলে equinox, ষোড়শ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তির 'ব্লুমেনট্টিট'কে ব্লুমেনট্রিট, অনুগ্রহ করে পড়লে অর্থবোধে অসুবিধা হবে না।

প্রথম সংস্করণ পড়ে বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচক যেসব প্রশ্ন রেখেছিলেন সে বিষয়ে আমার বিনীত বক্তব্য যথাস্থানে রাখবার চেষ্টা করেছি। তবে সব প্রশ্নের সমাধান এখনও করতে পারিনি। যতদূর সম্ভব, চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি উত্তর পাবার।

বর্তমান সংস্করণে যে নির্দেশিকা দেওয়া হলো তা যথেষ্ট নয় বলে মনে হলেও নিরুপায় হয়ে থামলাম। নির্দেশিকা রচনায় সাহায্য করেছেন আমার কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী শিপ্রা সরকার।

পরিশেষে লোকসংস্কৃতি রসিক এবং বিদগ্ধ পাঠকের হাতে এই সংস্করণ তুলে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

৮/৩, সন্তোষপুর ওয়েস্ট রোড
কলকাতা—৭০০০৭৫

দীনেন্দ্রকুমার সরকার

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ঘটনা	...	...	১
বিস্তার	...	...	২
দেশে দেশে	...	...	১০
দেবতার বিবর্তন	...	...	৩২
পশুগমন	...	...	৪৬
পুষ্পোৎসব ও উর্বরতা	...	...	৫৫
গোত্রহত্যা	...	...	৬৫
তন্ত্র ও বলি	...	...	৮০
সমাজ ও কুমারী	...	...	১০৯

মানবসভ্যতায় কুমারীবলি প্রভৃত তথ্য ও তত্ত্ববিচার সম্বলিত একটি মূল্যবান রচনা। ধর্মের নামে, তথাকথিত দেবতার তৃপ্ত্যর্থে কিভাবে অসহায় বালিকাদের ধরে আনা এবং নৃশংস যৌন যথেচ্ছাচারের পর হত্যা করা হত, দেশবিদেশের সুপ্রাচীন সমাজেতিহাস থেকে লেখক তার অজস্র প্রমাণ, নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। নৃতাত্ত্বিক সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের আদিমতম অধ্যায়ে যেসব জিনিস হত, তার জের যে আজও ষোল আনা শেষ হয় নি, তা জেনে জিজ্ঞাসু মানুষরা নিশ্চয় স্তম্ভিত হবেন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ঘটনা

দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে ইতিহাস আর পুরাণ প্রসিদ্ধ স্থান ত্রিম্বক বা ত্র্যম্বক। ত্রিম্বকেশ্বরের মন্দিরেই কুশাবর্ত তীর্থ। পুণ্যার্থীরা এখানকার তীর্থ-পুষ্করিণীতে পুণ্যস্নান করেন। এই ত্রিম্বকেরই আশেপাশে এগারোর কাছাকাছি বয়সের ছ'টি কুমারীকন্যার বলি হয়েছে পর পর। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এদের হত্যা করে, প্রতিক্ষেত্রেই তাদের স্ত্রী-অঙ্গগুলি কেটে নেওয়া হয়েছে।

'কোলিঙ্গ' সম্প্রদায়ের বিত্তশালিনী এক নারী সন্তান কামনায়, কোনো এক বৈদ্যর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটিয়েছে। চল্লিশের নিচে বয়স হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে সন্তান কামনায় বশবর্তিনী। তাই শরণ নিয়েছে বৈদ্যের। বৈদ্যটি এক বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবতার প্রত্যাদেশ শুনিয়েছে সন্তানকামিনীকে—মোরগ নয়, পাঁঠা নয়, পুরুষ নয়, বয়স্কা নারী নয়, কুমারীবলি চান দেবতা।

কিন্তু দেবতাটি কে?

বৈদ্যের কাছ থেকেই জবাব এসেছে—বেতাল মহারাজ। দৈত্যাধিপতি বেতাল মহারাজের কুমারী-কন্যা ভিন্ন অন্য বলিতে রুচি নেই।

এরপরই শুরু হয়েছে একের পর এক নিষ্পাপ কুমারীকন্যার পৈশাচিক হত্যা। প্রতিক্ষেত্রেই বালিকাদের খুন করে তাদের দেহ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে স্ত্রী-অঙ্গটি এবং তারই রক্ত নিকটবর্তী এক দুর্গম পর্বতচূড়ায় সুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত এবং একদা বহুপূজিত, দৈববাণী অনুসারে বুভুক্ষু বেতাল মহারাজের পাষাণ মূর্তির সামনে পুরোহিতের দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

এতেও কিন্তু দেবতার সন্তুষ্টি নেই। তৃতীয় বলির পর তিনি আদেশ করেছেন—শুধু জননাঙ্গের শোণিতে তৃপ্ত নন তিনি। সঙ্গে চাই কুমারীকন্যার হাতের একটি আঙুল এবং মুণ্ডটিও। আর, সেই অর্ঘ্য পুরোহিত নিবেদন করলে চলবে না। দেবতার কাছে আদিষ্ট বস্তু নিয়ে পূজারিণীকে যেতে হবে; তাকেই নিবেদন করতে হবে এইসব।

পরিচালনা করেন, মহারাষ্ট্রের সেই ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ শ্রী ইম্যানুয়েল সুমিত্র মোদক আই. পি. মহোদয়ের 'ব্ল্যাক মাজিক ইন নাসিক' লেখাটি পড়ে একদিকে যেমন আবিষ্ট হয়েছি সমস্ত ঘটনার বীভৎসতায়, অন্যদিকে অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানকারীদের সম্বন্ধে জেনেছি নতুন কিছু তথ্য।

বৈদ্যটি তার ছেলেবেলাতে এক 'মশানযোগী'র কাছে এই 'ভানমতী' বিদ্যা শিখেছে। তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে যাদের কারবার, সেই 'মশানযোগী'দের কিছুতেই গৃহী-জীবনযাপন করা চলবে না। তাই বলে এরা নিঃসঙ্গ থাকে না। অশুভ আত্মাদের রাজকুমারের আদেশে, নিজেরা অবিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত 'ভানমতী' বিদ্যায় পারদর্শী 'মশানযোগী' বিপরীত লিঙ্গের আত্মাদের শয্যাসঙ্গী করে। কতকগুলি পূর্বশর্ত পূরণ করতে পারলে নারী অথবা পুরুষ যে কেউই 'মশানযোগী' হতে পারে —বলেছেন স্মেরস তার 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' গ্রন্থে।

বিস্তার

একদিকে অসহায় নিষ্পাপ এই কুমারীকন্যাদের পৈশাচিক বলির কথা, অন্যদিকে তন্ত্রমন্ত্রের অলৌকিকতায় এবং কুমারীহত্যায় দৃঢ় বিশ্বাসী 'মশানযোগী'দের এই ধরণের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে প্রশ্ন জাগলো—মহারাষ্ট্রের এই ঘটনাটি সাম্প্রতিককালে ঘটলেও, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুমারীবলি —একি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? নাকি, এর সঙ্গে মানবসভ্যতার ধর্মীয়-চিন্তা বিকাশ-প্রক্রিয়াটির কোনো যোগ আছে ?

মনে পড়ে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটির কথা। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'কাপালিক প্রসঙ্গে'। এখানে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে বলছে— 'এখন পালাও। নরমাংস না হলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তা কি তুমি জান না?' অষ্টম পরিচ্ছেদ 'আশ্রয়ে' কপালকুণ্ডলা অধিকারীকে বলছে—'তিনি যে আমাকে এতকাল প্রতিপালন করিয়াছেন।' (অধিকারী)—'কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।' এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিকসাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না। কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। অথবা ষষ্ঠ খণ্ডের 'পুনরালাপে' কাপালিক বলছে—'আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম। যেন ভবানী আসিয়া কহিতেছেন—'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধিহেতু আমার পূজায় বিঘ্ন জন্মিয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই

কুমারীর শোণিতে আমার পূজা করিস নাই। ...আমি তোর নিকট আর পূজা গ্রহণ করিব না'।[১]

মুঘল আমলের বঙ্গদেশ উপন্যাসটির পটভূমি। এখানেও স্পষ্ট রয়েছে তন্ত্রসাধনার দু'টি দিক। একদিকে দেবী ভবানী চান 'কুমারী' কপালকুণ্ডলার তপ্ত শোণিতে আত্মতৃপ্তি, অন্যদিকে কাপালিক মনে করে, তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে চাই 'ইন্দ্রিয় লালসার' পরিতৃপ্তি।

নাসিকের ঘটনায় বেতাল মহারাজকে উৎসর্গ করা হয়েছে কুমারীকন্যার স্ত্রী-অঙ্গের রক্ত, কপালকুণ্ডলাতেও দেবী ভবানীর একান্ত ঈপ্সিত কুমারী-শোণিত। এরই জন্য ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত কপালকুণ্ডলা কাপালিক গৃহে প্রতিপালিতা। কাপালিকের উদ্দেশ্য তাকে সাধন-সঙ্গিনী করা। অন্যভাবে বললে, হত্যা এবং যৌন আচরণ একই সাধনায় যুগপৎ মিশেছে।

কিন্তু প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র কুমারীকন্যা-বলির এই তন্ত্রসাধনার পদ্ধতিটি কোথায় পেলেন? সমকালীন সমাজজীবনের প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তায় কোথায়ও এই প্রথা ছিল এমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কালিকা পুরাণের 'রুধিরাধ্যায়' এবং 'বলিদান' অধ্যায়ে আছে—

> 'বলিদ্বারা চণ্ডীকাকে সর্বদা তুষ্ট করিবে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, নবপ্রকার মৃগ: —যথা বরাহ, ছাগল, গোধা, শশক, বলয়, চমর কৃষ্ণসার, শশ, সিংহ, মৎস্য, স্বগোত্র, স্বগাত্র রুধির এবং ইহাদের অভাবে হয় এবং হস্তী—এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ছাগল, শবর এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি নামে প্রসিদ্ধ।[২] কামাখ্যা, বিন্ধ্যবাসিনী, রাজরাজেশ্বরী, যোগাদ্যা, করুণাময়ী প্রভৃতি দেবীর নিকট নিয়মিত ভাবে নরবলি হইত'।[৩]

নরবলির উল্লেখ থাকলেও নারী তথা কুমারীবলির কথা কোনো তন্ত্রসাধনার বইতে স্থান পায়নি। বরং নারীবলি চলবে না এমন কথাই কেউ কেউ বলেন। স্বভাবতই এই নিষেধ প্রমাণ করে যে, কোনো কোনো সাধনপদ্ধতিতে কুমারীবলির প্রথা ছিল।

বঙ্কিম উপন্যাসে যেমন পাই, ঠিক একই ধরণের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় ভবভূতির 'মালতীমাধব' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে। সেখানে অঘোরপন্থী বামাচারী

কাপালিক নায়িকা মালতীকে দেবী চামুণ্ডার কাছে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু কুমারীবলিই নয়, আলোচ্য নাটকে এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'ও নরমাংস বিক্রয়ের কথা আছে।[৪]

কপালকুণ্ডলায়, মালতীমাধবে যেমন, ঠিক তেমনই দেখা যায় গুণাঢ্য রচিত 'কথাসরিৎসাগর'—গ্রন্থের 'নাবালক'—নামক তৃতীয় লম্বকের অষ্টাদশ তরঙ্গে কুমারীবলির। সেখানেও শবসাধনায় নিরত কোনো এক সন্ন্যাসী শববাহন হয়ে শূন্যমার্গে কোনো এক দেবী মন্দিরে গিয়ে দেবীর আদেশ অনুসারে রাজার কুমারী কন্যাকে কেশাকর্ষণে, শূন্যমার্গে এনে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে হলে বিদূষক কর্তৃক নিহত হলো।[৫]

বঙ্গদেশে ডাকাত-কালীর কাছে কুমারীবলির কাহিনী কোনো কোনো লেখায় পড়েছি বলে মনে পড়ে। এমন কি প্রভূত পরিমাণে দর্শক আকর্ষণ করে প্রদর্শিত ছায়াচিত্র 'বাবা তারকনাথে'ও কুমারীবলির একটি দৃশ্য আছে।

নাটকে বা উপন্যাসে বা ছায়াচিত্রে ব্যক্তি তথা সমাজজীবনেরই প্রতিফলন ঘটে। 'কপালকুণ্ডলা', 'মালতীমাধব', 'বাবা তারকনাথ' সবত্রই তাই ঘটবে এবং এর মধ্যে বৈচিত্র্য বা অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। যদি কেউ তাকে ঔপন্যাসিক নাট্যকার বা চিত্রনাট্য লেখকের স্ব-কপোলকল্পিত বলে উড়িয়ে দিতে চান, তবে বলতে হয় আলোচ্য চিত্রে বা পুস্তকে বর্ণিত ঐ দৃশ্যগুলির বিরুদ্ধে কেউ অনৈতিহাসিকতা বা ঐতিহ্য-বিরোধিতার অভিযোগ তুলেছেন বলে আজও পযন্ত আমার জানা নেই। বিরোধিতা কেউ করেন নি, তার কারণ এ প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল।

জেম্‌স্‌ হেস্টিংস তাঁর 'এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিক্‌স্‌' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে 'হিউম্যান স্যাকরিফাইস' অধ্যায়টিতে লিখেছেন যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা প্রতাপগড় দুর্গে বার্ষিক 'শতরস' উৎসবে একটি বৃদ্ধা রমণীকে বলি দিত।[৬] এই অধ্যায়েরই অন্যত্র বলেছেন ; ভারতের সর্বত্রই একটা কুসংস্কার আছে যে, প্রোথিত সম্পদ 'দানো'র অধিকারভুক্ত। দক্ষিণ ভারতে এই উদ্দেশ্যে নরবলি প্রশস্ততম

৪. ঐ। পৃঃ ১৫৩।

৫. কথাসরিৎসাগর, বসুমতী সংস্করণ, কলকাতা

৬. The Brahmans of the Daccan used to sacrifice an old woman on he occasion of Sataras annual visit to the Fort of Pratabgarh.

ভ্রাতৃবধূ ননদকে কালীর কাছে বলি দিয়েছে। বলির আগে হতভাগিনীর একটি কড়ে আঙ্গুল কেটে, সেই রক্তে রুটি ভিজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক সাধুর কাছে। সেই রক্তে ভেজানো রুটি সাধুবাবা খেয়েছিলেন কিনা, ঘটনার বিবরণে তার প্রকাশ নেই। তবে মনে হয় যেন তিনি খেয়েছিলেন। কারণ তন্ত্রসাধনার বিশেষ বিশেষ পন্থায় কুমারী-শোণিত পান ও বিচিত্র ব্যবহারের রীতি ছিল। তার উল্লেখ এবং আলোচনা পরে করব। নাসিকের ঘটনায়ও বেতাল মহারাজের কাছে বলির আঙ্গুল উৎসর্গের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

গুপ্তধনের সঙ্গে গর্ভবতী নারী হত্যার মতোই কুমারী প্রথমা কন্যাবলির একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় হায়দ্রাবাদ পুলিশের একটি রিপোর্টে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গুপ্তধন উদ্ধার করে সেই গর্তে আঠারো মাসের একটি শিশুকন্যাকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হয়েছিল।[১১]

পাঞ্জাবের কাংড়া পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিবছর একটি প্রাচীন দেবদারু গাছের কাছে একটি কুমারীকন্যাকে বলি দেওয়া হত।[১২]

বিভিন্ন উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কুমারীবলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতে এই চিন্তাধারার বিস্তার ঘটল কিভাবে? কুমারীকন্যাকে বলি দিলে দেবীরা অথবা বেতালগোষ্ঠী দানো

১১. Ibid, P. 159.
Hydrabad State Police report for 1333 fasli :
One Radhama in Nalgonda district, asked a Kumbi woman to procure for her a first born infant girl for the purpose of unearthing a treasure trove, buried in her house...seeing the 18 month old daughter of a local goldsmith playing in the street kidnapped the child and took it to Radhama...At nightfall Radhama went to the spot were the treasure trove was supposed to have been burried, accompanied by four men. Then while one of the men chanted incantations, the other men excavated the ground.

...when the treasure trove had been found the baby girl was fetched from the place where it was concealed, and brutally sacrificed to the guardian spirits and buried in the pit from which the treasure was removed.

১২. J. G. Frazer : The Golden Bough (Ab. edition) London 1963. P. 148.

Among the Kangra mountains of the Punjab a girl used to be annually sacrificed to an old cedar-tree, the families of the village taking it in turn to supply the victim.

অথবা বৃক্ষ-দেবতা সন্তুষ্ট হন—এ চিন্তার ঐতিহ্য সূত্র নিহিত রয়েছে কোথায়? নারীবধের একটি অত্যন্ত ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায় শতপথ ব্রাহ্মণে। শ্রী হচ্ছেন সর্বশুভের প্রতীক। তাঁকে দেবতা অথবা মানব উভয়েই কামনা করেন। এমনকি দেবতারা নারীহত্যার উদ্যোগী হলেও শ্রীদেবী তাঁর বরদ-হস্ত গুটিয়ে নেন না।[১৩] কিন্তু, কে এই শ্রী বা লক্ষ্মীদেবী? শ্রীময়ী বা লক্ষ্মীময়ী সম্বন্ধে বৈদান্তিক ধারণা কি?

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬. ৪. ৬ সংখ্যক মন্ত্রে বলা হয়েছে: শ্রীঃ হ বৈ এষা স্ত্রীণাম্‌. যৎ মলোদ্বাসা। অর্থাৎ, যে স্ত্রী ঋতুকালীন মলীন বাস পরিত্যক্তা, সে স্ত্রীগণের মধ্যে লক্ষ্মীরূপা।[১৪]

ঋতুস্নাতা নারীই ঔপনিষদিক চিন্তায় লক্ষ্মীরূপা। শ্রীময়ী। এই লক্ষ্মীরূপা শ্রীময়ী নারীর পরিশীলিত চিন্তাতেই পরবর্তীকালের মানবী মূর্তিধারিণী লক্ষ্মীদেবীর সদৃশ দেবীর কল্পনা করা হয়েছিল এমন ইঙ্গিত কোনো কোনো সভ্যতায় পাওয়া যায়।[১৫]

সর্বশুভের প্রতীক শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীও নারীবধে অসন্তুষ্ট নন। অন্যদিকে ধনাধিপতি কুবের (লক্ষ্মীও তো ঐশ্বর্যেরই দেবী)' যক্ষ, তান্ত্রিক দেবী চামুণ্ডা অথবা কালী কিংবা বেতাল মহারাজ নারী অথবা কুমারীকন্যার রক্ত পেলে তৃপ্ত হন।

ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জলদেবতা বরুণের উদ্দেশ্যে প্রথম পুত্রকে উৎসর্গ করার, শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় পুরুষমেধের, তৈত্তিরীয় সংহিতায়, শাঙ্খায়ন বৈতান সূত্রে, অশ্বমেধ যজ্ঞে নরমেধের কথা থাকলেও একমাত্র শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্বোল্লিখিত বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়া বৈদিক-সাহিত্যের অন্য কোথাও, নারীমেধ বা কুমারীবলির কথা আছে— এখনও পর্যন্ত আমার জানা নেই।

কিন্তু লৌকিক চিন্তায়, কোনো কোনো স্থানে নতুন সেতু নির্মানের সময় কুমারীকন্যাকে বলি দিয়ে তার রক্ত অথবা জীবন্ত কন্যাকে ভূ-প্রোথিত করার কথা শোনা যায়।[১৬]

এ ছাড়াও, নারীমেধের প্রমাণ আছে, বর্তমান গ্রন্থের প্রচ্ছদ-চিত্র, সিন্ধুসভ্যতার সীলমোহরে। সীলের (উপরেরটি), বাঁদিকে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষের একহাতে কাস্তে জাতীয় অস্ত্র, অন্য হাতখানি কোমরে। তার সামনে আলুলায়িত-কেশে উপবিষ্টা একটা নারী ; পা দু'খানি ছড়ানো, হাত তুলে বিপদাপন্ন অবস্থায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। সমস্ত দৃশ্যটি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা আদৌ অসমীচীন হবে না যে, এটি নারীবলির দৃশ্য। কুমারী কি বিবাহিতা সেটা বোঝবার উপায় নেই।

জনৈক গবেষক তাঁর একখানা গ্রন্থে মহেঞ্জদারোর লিপির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হচ্ছে 'সপ্ত-ভূ-হুরি' অর্থাৎ পৃথিবী নারী।[১৭] এই সীলমোহরের (প্রচ্ছদের নিচের চিত্র দেখুন) অন্য পিঠে দেখা যাচ্ছে, একটি নারীর স্ত্রী-অঙ্গ থেকে গাছ বেরিয়ে আসছে। সীলের দুটি পিঠ মিলিয়ে দেখলে সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে মানুষ যখন নারীকে, তার প্রজনন শক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির আধাররূপে কল্পনা করতে শুরু করেছে, তখন তাকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে, এখান থেকেং উদ্ভিদ জগৎ ও সৃষ্ট—এই ধরণের চিন্তাকে মূর্তিতে রূপদান করেছে। অন্য দকে প্রদত্ত নারীর কবন্ধ নিঃসৃত শোণিত সমস্তরকম সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে পারে— এমন অবাস্তব চিন্তাও যুগপৎ কাজ করেছে।

এই সীলমোহর সম্বন্ধে অন্য এক গবেষক মন্তব্য করেছেন : নগ্নদেহা নারীকে কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে হত্যা কবার মাধ্যমে ক্ষেত্রের উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পায় -এই বিশ্বাস পৃথিবীর সমস্ত জাতকোমগুলির মধ্যেই ছিল।[১৮]

উদ্দেশ্য যাই হোক, অন্ততঃ সিন্ধুসভ্যতার যুগে কিম্বা তারও অনেক আগে থেকে শুরু করে, ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাবভাবনায় এবং বিশেষ পদ্ধতির ধর্মীয় চিন্তার ধারক ও বাহক একশ্রেণীর আচার-অনুষ্ঠানে নারী তথা কুমারী-কন্যার বলির ঐতিহ্য বহুদিন ধরে চলে আসছে। ত্রিম্বকের ঘটনা সেই ধারারই আধুনিক কালের একটি বৃহৎ, বীভৎস তরঙ্গ মাত্র।

এই ধরণের কুমারীবলির একটি ঘটনা ঘটেছে অতি সাম্প্রতিককালে সিঙ্গাপুরে।— রয়টারের খবর অনুযায়ী, আড্রিয়ান লিস (৪১), তার স্ত্রী তান মুই চু (২৮) কে এবং আড্রিয়ান লিস-এর সাতাশ বৎসর বয়স্কা বান্ধবী হো কঃ হঙ্কে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে হাইকোর্টে তাদের বিচার চলছে।

১৭. রাজমোহন নাথ। মহেঞ্জদরোর লিপি ও সভ্যতা। শিলং ১৯৬১। পৃঃ ৯২।

১৮. পল্লব সেনগুপ্ত। ভারতের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও দেবকল্পনা—সিন্ধুসভ্যতার যুগে। মাসিক বাঙলাদেশ। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৮৩, কলকাতা। পৃঃ ২৩৪।

এরা তিনজন, ভারতীয় দেবতার বেদীতে, তাদের পূজা-অর্ঘ্য হিসাবে আট বৎসর বয়স্ক এ্যাগনেস সিউ হেয়ক এবং দশ বছরের গজালি মারজুকি নামক বালককে হত্যা করে। কুমারী এ্যাগনেসকে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে শ্বাসরোধ করে হত্যার পূর্বে ধর্ষণ করা হয়। ছেলেটির পোড়া মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তাকে ওষুধ খাইয়ে ডুবিয়ে মারা হয়।[১৯]

কুমারীকন্যার আত্মাহুতি শুষ্ক পুষ্করিণীকে জলপূর্ণা করে তুলতে পারে—এমন কাহিনী প্রচলিত আছে পাঠানকোটের নিকটবর্তী চম্পাবতী শহরের ইতিকথা প্রসঙ্গে।[২০] শিশুপুত্রের শোণিত ও একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছে পূর্ববঙ্গে অগ্রহায়ণের প্রতি রবিবারে অনুষ্ঠেয় 'নাটাই'-ব্রতের কথায়।

প্রায় ঠিক একই ধরণের, যদিও এখানে বিবাহযোগ্যা ভগিনীকে, পুকুরকে জলে পূর্ণ করার জন্য, উৎসর্গ করার গল্প প্রচলিত আছে (সম্ভবত সাঁওতাল পরগণার কোনো অঞ্চলের) সহোদর সাত ভাইদের দ্বারা।[২১]

---

১৯ The Statesman, Calcutta dt. 30.3 83. p. 5/5

Singapore March 29—Two children were sacrificed in a black magic ritual on an alter to Indian gods, Singapore's High Court was told yesterday, reports Reuter.

The police found books on witch craft, electrical godgets and a newspaper cutting with a story about human sacrifice at the flat of Adrian Lim (41) and his wife, Tan Muichoo (28), the production told the court. The couple pleaded guilty to killing the children. But the court rejected the admission and ordered the trial to continue. Also on trial was Hoe Kah Hong (27), described in the court as Mr Lim's girlfriend.

The procutor told the court that the three ethnic chinese killed Agnes Siew Heok (8) and Ghazali Marzuki (10) in Mr. Lim's flat on a big housing estate two years ago.

Agnes was raped and suffocated Her body was found in a brown canvas bag at the foot of block of flats in the estate, the court was told. The body of the boy, with burns, was found two weeks later. He had been drugged and drowned A syringe containing his blood was found in the flat, the prosecutor said. He added that the children were abducted and murdered in "unholy ritualistic practices."

২০. শৈলেন দেব। চম্পাবতীর সহর। শুকতারা, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। কলকাতা ১৩৬৪। পৃঃ ২৫১-৫৫।

২১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার: আদিবাসী লোককথা, ১ম খণ্ড, কলকাতা ১৯৮২। পৃ. ১৩২-৪০। ভারতের কোন অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোককথা এটি শ্রীমজুমদার তা বলেন নি কোথাও। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো যে, শ্রমজীবী মানুষ গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনকথাকে ধরে রাখেন। কোন সমাজে নির্দিষ্ট গল্পটি প্রচলিত, তা জানতে পারলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর গবেষক তাঁদের বক্তব্যকে সহজে উপস্থাপিত করতে পারেন।

আজও স্বামীপুত্রের মঙ্গল বা রোগমুক্তির কামনায় অথবা বিশেষ ধরণের বিপদমুক্তির জন্য কুল নারীরা দেবতার কাছে শপথ করেন—'যদি এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাই তবে আমার বুকের, আঙুলের রক্তে তোমার পূজা করব'। এই ধরণের চিন্তা বা অনুষ্ঠান মানবিক দিক থেকে নারীকে আমাদের কাছে মহনীয় করে তুলেছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এই চিন্তা বা অনুষ্ঠান কি সুপ্রাচীন নারীবলি অনুষ্ঠানের নবতর সংস্করণ নয়?

দেশে দেশে

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কুমারীকন্যা-বলির যে চিত্র পৃথিবীর নানান দেশে বিভিন্ন সভ্যতায় ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এইসব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য এবং ভাবনা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশে জন্মলাভ করেছিল তেমনি মূল প্রথাটিও প্রচলিত ছিল বিভিন্ন রূপে। বিভিন্ন সভ্যতায় এই প্রথাটি কোন কোন রূপ নিয়ে ছড়িয়ে আছে এবং তার কাঠামোগত বিভিন্নতা কি কি—এবার তাই দেখা যাক। যেমন প্রাচীন গ্রীসে আমরা দেখতে পাই :

যে কোনো কারণে হোক, দেবী আর্তেমিস আগামেমননের উপর রুষ্ট হন। প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেবী চাইলেন আগামেমননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে। আগামেমনন যখন তাকে বলি দিতে উদ্যত তখন আর্তেমিস ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে একটি মৃগী বলি দিতে আদেশ করলেন। একটি কাহিনী অনুসারে দেবীর আদেশ পালিত হল। কিন্তু ইফিজেনিয়ার জীবন পরিক্রমার বাকি পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। সে হল আর্তেমিসের মন্দিরের দেবদাসী। মতান্তরে, তাকে বলিই দেওয়া হয়েছিল।[২২]

এই আর্তেমিসের পরিচয় কি?

জেয়ুস এবং লেটোর কন্যা এ্যাপোলোর যমজ বোন আর্তেমিস ডায়না এবং সিন্থিয়া নামেও পরিচিতা। তিনি আরণ্যজীবনের দেবী, দেবতাদের শিকারনেত্রী তারুণ্য এবং যৌবনের রক্ষাকর্ত্রী। অথচ তাঁরই কাছে ট্রয়যুদ্ধের প্রাক্কালে কুমারীবলি দিতে হয়েছিল। অন্যদিকে, কোনো স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি শান্তিতে মরলে বলা হয়—সে নাকি আর্তেমিসের শরাঘাতে মরেছে।[২৩]

২২. O. A. Wall : Sex and Sex Worship U. S. A. 1920 P 225.

২৩. Edith Hamilton : Mythology (Timeless Tales of Gods and Heros), U. S. A. 1963. P. 31.

এ দেবীর পরিকল্পনা অরণ্য-পরিবেশে শিকারজীবনের অর্থনীতিতে। তিনি জানেন, তারুণ্য তথা যৌবনকে রক্ষা না করতে পারলে প্রজনন, গোষ্ঠীর রক্ষা এবং বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। তিনি ছিলেন উর্বরতা, বিবাহ এবং প্রজননের দেবী। শিকারী অথবা মৎস্যজীবীরা তাদের প্রথম শিকারলব্ধ বস্তু তাঁর মন্দিরে উৎসর্গ করত অথবা গাছে ঝুলিয়ে দিত উৎসর্গ হিসাবে। দগ্ধ ভল্লুক অথবা উৎসর্গীকৃত ছাগ ছিল তাঁর বলি। এথেন্সে তিনি ছাগ নয় ছাগী বলি গ্রহণ করতেন। প্রজননের দেবী হিসাবে তারই মন্দিরে—'যৌবন-দীক্ষা' (ইনিসিয়েসন কাস্‌টমস্‌) অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ থেকে দশ বছরের কুমারীকন্যারা জাফরানী রঙের পোষাক পরে তার মন্দিরের নাচত প্রাক্‌-বিবাহ অনুষ্ঠান হিসাবে। তখন তাদের বলা হত ভল্লুকী। এই নাচ না নাচলে চলতই না বিয়ের আগে।[২৪] তবু তারই কাছে কুমারীবলি হত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ এক রহস্যময় জটিলতা।

গ্রীকপুরাণ অনুসারে, ট্রয়ের নৃপতি প্রিয়াম এবং তার মহিষী হেকুবার কন্যা পলিকসেনা। পলিকসেনা ছিল একিলিসের বাগ্‌দত্তা। ট্রয় ধ্বংস এবং একিলিসের মৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মা এসে পলিকসেনার বলি দাবি করল। গ্রীকরা অনুমতি দিল। একিলিসের সমাধির উপর পলিকসেনাকে বলি দেওয়া হল।[২৫] প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে এই বলি নিবেদন ভারতীয় চিন্তাধারার মতই।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে বা মহামারির সময়ে এথেন্সের জনগণ এক সুপ্রাচীন দৈববাণীর আদেশ মান্য করে গেরিস্‌টাস্‌ সাইক্লপ্‌স্‌-এর সমাধির উপর হেসিন্থাসের কন্যাদের বলি দিত।[২৬]

এরিপিডিসের হেরাক্লিডে দেখা যায়: ডেমাফোন হেরাক্লিসের শিশু-সন্তান-দের তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলে আরজাইন-রা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ডেমাফোন যখন এই অভিযানকে প্রতিহত করতে চলেছেন, তখন দৈবজ্ঞরা বলল, যুদ্ধে জয়ী হতে হলে পারসিফোনের কাছে একটি উচ্চবংশজাত কুমারীকন্যাকে বলি দিতেই হবে।[২৭]

কুমারীবলির কাহিনী এথেন্স সম্পর্কেও প্রচলিত। লোক্রিস থেকে প্রথম

২৪. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend S. D. F. M. & L (Vol I) Edited by Maria Leach. New York: 1949. P. 76.

২৫. Sex and Sex Worship: Ibid. P. 225.

২৬. Mythology: Ibid. P. 151.

২৭. S. D. F. M. & L. Vol 2. (Ibid) P. 729.

এবং প্রাচীন ইউরোপের পর আমরা মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট কয়েকটি রূপ নিয়ে আলোচনা করবো।

নীল নদের জল যাতে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রতি বছর একটি কুমারীকন্যাকে নীল নদে ডুবিয়ে দেওয়া হত। ফ্রেজারের মতে, এটি কুমারীহত্যা নয়, নীল নদের পুরুষশক্তির সঙ্গে কুমারীকন্যার মিলন। অর্থাৎ এতে নীল নদ জলস্ফীত হবে; শস্যক্ষেত্রের প্রাচুর্য বাড়বে।[৩৩]

মিশরের প্রাচীন সীলমোহরেও প্রতি বছর একটি করে যুবক ও যুবতীদের বলি দেওয়ার ঘটনা বর্ণিত।[৩৪]

হেরোডোটাস বলেছেন: অ্যারেকসাস এবং তাঁর মহিষী যখন শুনলেন যে, তাঁরা এমন স্থানে উপস্থিত হয়েছেন, যার নাম 'নবপথ' (নাইনওয়েজ), তখন তারা ন'টি ছেলেকে জীবন্ত সমাহিত করলেন। দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন্ত সমাহিত করা প্রাচীন রীতি।[৩৫]

কেনানের গেজের কবরস্তূপ থেকে একটি আঠারো বছরের তরুণ এবং আনুমানিক ষোল বছরের একটি তরুণীর একই সঙ্গে রাখা কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে।[৩৬] অনুমান করতে অসুবিধা নেই, এই হতভাগ্যদেরকে একইভাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

স্যার রিচার্ড বার্টন গ্রেট বেনিনে দেখেছিলেন: একটি মেয়েকে বিধ্বস্ত একটি গাছের মগডালে বেঁধে তাকে মেরে ফেলতে। মৃতদেহটি ওখানেই থাকবে। সেটাকে শকুনে খাবে। জায়গাটা ওই অঞ্চলের মানুষের পীঠস্থান। এই বিচিত্র পদ্ধতিতে নারীবলির উদ্দেশ্য—বর্ষণ-এর দেবতার অনুগ্রহ লাভ।[৩৭] এই কাহিনীটির অবশ্য নানাবিধ রূপান্তরও আছে।*

৩৩. The Golden Bough (abgd edn): Tradition runs that the olden custom was to deck a young virgin in gay apparel to throw her into the river as a sacrifice to obtain a plentiful inundation. Whether that was so or not, the intention of the practice appears to have been to marry the river conceived as a male power to his bride the cornland, which was so soon to be fertilised by his water. p 488.

৩৪. Encyclopaedia of Religion and Ethics: Ibid.

৩৫-৩৮. Encyclopaedia of Religion & Ethics: Ibid

* অবিরাম বর্ষণ হলে গ্রেট বেনিনের লোকেরা 'জুজু' এবং বলির জন্য রাজার কাছে আবেদন করত। ফলে বলির জন্য একটি মেয়েকে নির্বাচন করা হত। এই রমণীকে দিয়ে বর্ষণের দেবতার বন্দনাগান গাইয়ে তাকে নিয়েই হত সমবেত প্রার্থনা। প্রার্থনা শেষে মুগুরপেটা করে তাকে মেরে মৃতদেহটিকে গাছের ওপর এমন জায়গায় রাখা হত যাতে বর্ষণের দেবতার নজরে পড়ে। (এইচ্. লিঙ- রথ: গ্রেট বেনিন। হ্যালি ফ্যাক্স ১৯১৩। পৃ: ২৭)

ফ্রেজার তাঁর 'স্কপ গোট' গ্রন্থে বলেছেন : দেশ থেকে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নিগ্রোদের দেশের একটি মেয়েকে মাটির উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা মনে করে, এইভাবে দেশের পাপকে সাপ্‌টে পরিষ্কার করা হল। এরপর মেয়েটিকে জলে ডুবিয়ে মারা হবে।

মড়ক লাগলে 'চিপোয়া'রা মনে করে, তাদের পাপের ফল। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং প্লেগের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা গোষ্ঠীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারত।[৩৮]

উনবিংশ শতাব্দীতে দৈত্যদেবী পেলীর কাছে কুমারীকন্যা উৎসর্গ করা হত। পেলী হচ্ছে আগ্নেয়গিরি 'কিলোউয়া'র দেবী। বলির নিয়ম হল— আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে মেয়েটিকে ভেতরের ফুটন্ত লাভা-সরোবরের মধ্যে ফেলে দেওয়া।[৩৯]

নিগার নদীর পাশে ওনিস্থা-তে ১৮৫৮র ২০শে ফেব্রুয়ারী রেভারেণ্ড টেলর যে কুমারীবলি দেখেছিলেন, তা এইরকম।—

উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটি মেয়ে। অঞ্চলের লোকেরা মেয়েটিকে, তার মুখ নিচের দিকে করে, রাজবাড়ি থেকে দু'মাইল দূরের নদী পর্যন্ত মাটির ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে, জ্যান্ত অবস্থায় নিয়ে নদীতে ডুবিয়ে দিল।[৪০]

শ্বেত নীল নদের তীরে শিল্লুকদের বাস। এদের রাজা যদি কখনও তার রাণীদের দৈহিক কামনা তৃপ্ত করতে অসমর্থ হয়, তবে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। ব্যাপারটা ঘটে এই রকম।—উল্লিখিত অবস্থায় এলে রাণীরা গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রধানের গোচরে আনে ব্যাপারটা। গোষ্ঠী প্রধানরা তখন রাজাকে মাথা থেকে হাঁটু পর্যন্ত সাদা কাপড়ে ঢেকে দেয়। এই অবস্থায় তাকে শুয়ে থাকতে হয়। এর পরবর্তী অধ্যায়েই রাজার হত্যা।

এই উদ্দেশ্যে একটি কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হবে। রাজাকে ঢোকানো হবে সেখানে এবার তাকে শোয়ানো হবে একটি সদ্য-কৈশোর-প্রাপ্ত কুমারীর কোলে মাথা রেখে। ঘরের দরজা জানালা বা কোনো ফাঁক এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে যাতে বাতাস চলাচল না করতে পারে। এই অবস্থায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, আলো হাওয়ার অভাবে তিলে তিলে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে রাজার সঙ্গে হতভাগ্য নিষ্পাপ কুমারীকন্যা।[৪১]

---

৩৯. **Sex and Sex Worship : Ibid. P. 226-27.**

৪০. **The Golden Bough, P. 351-52.**

৪১. **Ibid, P: 351-52.**

ইবন বতুতার একটি বিবরণ ঃ

মালডাইভ দ্বীপপুঞ্জ। এখানকার লোকেরা দেখতো—প্রতিমাসে একটি দুষ্ট জীন অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি জাহাজ করে দ্বীপের দিকে আসছে। সাগর বেলায় একটা মন্দির। জাহাজ দেখবামাত্রই দ্বীপবাসীরা একটি কুমারীকে নববধূর সাজে সাজিয়ে রাত্রে মন্দিরে রেখে আসতো। পরদিন দেখা যেতো মেয়েটি মৃত।[৪২]

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বুরুদ্বীপের অধিবাসীরা একই কাজ করে কুমীর-রাজপুত্রের তৃপ্তিসাধনের জন্য।[৪৩]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'প্রায় সমস্ত আদিম অসভ্য জাতিরা শিশুকন্যা বধ করিয়া ফেলিত। রাজপুতেরা করিত, আরব শেখেরা কন্যা জন্মিবামাত্রই গর্ত কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিত, কেঁধাপ্রদেশের আরবেরা শিশুকন্যার পাঁচ বৎসর বয়সে তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বে কন্যার জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিত ঃ "এইবার মেয়েকে গন্ধ মাখাইয়া দাও, সাজাইয়া দাও, আজ সে তাহার মায়ের ঘরে যাইবে!" অর্থাৎ, কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে। কোরিশের লোকেরা মক্কার নিকটবর্তী আবুদেলামা পাহাড়ে নিজেদের কন্যা বধ করিত।[৪৪]

শরৎচন্দ্রের 'কানকাটা' প্রবন্ধে আছে ঃ 'গিনিপ্রদেশের অনেকস্থানেই, "It was the custom annually to impale a young girl alive soon after the spring eguinot in order to secure good crops. A similar sacrifice is still annually offered at Benin... অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীরাও একটি কন্যাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিয়া ভূ-দেবীকে প্রসন্ন করিত এবং সেই গোরের উপর সমস্ত গ্রামের শস্যবীজ চুপড়িতে করিয়া রাখিয়া যাইত। তাহারা বিশ্বাস করিত, মেয়েটি দেবতা হইয়া ঐ বীজের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শস্য ভাল হইবে।[৪৫]

মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি মধ্যপ্রাচ্য এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলিতেও একই চিত্র। সবক্ষেত্রেই এক অদৃশ্য শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কখনো এককভাবে, কখনোও যুগ্মভাবে সমসংখ্যক তরুণ-তরুণীকে বলি দেওয়া হ—

---

৪২. Ibid, P. 191-92.

৪৩. Ibid, op. cit.

৪৪. শরৎ রচনা বলী (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ), ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৫১১।

৪৫. ঐ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪০১-০২।

এইসব অনুষ্ঠানের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ্ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু, ক্ষেত্রবিশেষে এইসব অনুষ্ঠান বা কাহিনী গুহ্যসাধন-পদ্ধতির অঙ্গ, কখনোও বা রূপকথা উপকথা তথা ইতিহাস পুরাণের অঙ্গীভূত, তাই বাস্তব বিশ্লেষণ অথবা উপকাহিনীর জটাজালে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃত তথ্য তার আদি স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে।

একই ধরনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে প্রাচ্যদেশেও।

কুমারীকন্যার আত্মাহুতির গল্প আছে চীনের প্রাচীন এবং পবিত্র শহর 'পিকিং'-এর ঘণ্টা নির্মাণ প্রসঙ্গে।[৪৬] পরবর্তীকালে কিশোরদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই হোক বা মূল কাহিনী পরিশীলিত হওয়ার জন্যই হোক, এখানে কুমারীশোণিতের কথা নেই। যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে, ঘণ্টার উত্তপ্ত মিশ্র ধাতুকে যথোপযুক্ত করে তোলার জন্য কারিগরের কন্যার আত্মাহুতির কথা। যেমন, অবিবাহিতা প্রথম ঋতুমতী কন্যার ঋতুরজঃ ব্যবহৃত হত জার্মানিতে শাণিত তরবারি তৈরির জন্য লোহাকে উত্তপ্ত করার সময়ে।[৪৭]

জাপানী গল্পে আছে, বছরের এক বিশেষ সময়ে সর্প ও বানর দেবতার কাছে কুমারীকন্যাকে উৎসর্গ করা হত।[৪৮] প্রাসঙ্গিক হবে জেনে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের 'লুজন' অঞ্চলের অধিবাসী সম্প্রদায়ের নাম 'ইগোরোট'। রবার্ট ব্রিফল্ট তাঁর 'দি মাদার্স' (লণ্ডন, ১৯২৭) গ্রন্থের ৫০-৫১ পৃষ্ঠায় প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ লেবো এবং ব্লুমেনট্রিটকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এদের সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়। এদের গোষ্ঠীশাসন এত কড়া যে, 'ইগোরোট' যুবতীরা এই নিষ্পেষণের ফলে যৌনবিকারগ্রস্ত হয়ে কামচরিতার্থতার উদ্দেশ্যে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানকার বানরদের সঙ্গে মিলিত হয়।

মনে হয় এই জন্য যে ভারতীয় লোককথায় এই ধরণের গল্প পাওয়া যায়। এখানে আমাদের লোককথা থেকে দুটি গল্প তুলে দিচ্ছি। প্রথম গল্পটি 'লাখের' জনগোষ্ঠীর। —কুমারীর বানর স্বামী The girl who married a monkey.

৪৬. প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিশোর সঞ্চয়ন, (কো-আং গল্প)। কলকাতা ১৯৭০।

৪৭. The Standard Dictionary of Folklore etc. Vol. 2. P. 706.

On the other hand, the blood of a newly menstruating girl a virgin, was used in Germany to give the proper temper to the metal forget into a sword.

৪৮. Encyclopaedia of Religion and Ethics : Op cit.

একটি মেয়ে সমস্ত পোষাক খুলে নদীতে স্নান করতে নেমেছে। স্নান সেরে মেয়েটি দেখে তার কাপড় এক বানর নিয়ে বসে আছে। একশর্তে সে কাপড় ফেরৎ দেবে তাহ'ল,—মেয়েটি বানরকে বিয়ে করবে। অনুনয় বিনয়ে কাজ হল না। বাধ্য হয়ে সে বানরটিকে বিয়ে করল। এলো স্বামীর ঘর করতে। কিন্তু মন পড়ে আছে নিজের ভাইয়ের বাড়িতে, যেখানে সে বড হয়েছে।

বানর এর ওর খেতের ফল চুরি করে এনে বৌকে খাওয়ায়। একদিন সে গেছে খাবার আনতে। তখন মেয়েটি তার শাশুড়ী (বানরী) কে মেরে তার চামড়া ছাড়িয়ে গায়ে পরে বসে রইল। বানর ফিরে এসে বৌকে দেখে না, দেখে মা বসে আছে। 'বৌ কোথায়'? জানতে চাইলে শাশুড়ীর বুড়ো কাঁপা গলায় চামড়ার ভেতর থেকে বলল যে, সম্ভবত বৌ পালিয়েছে। বানর রেগে গিয়ে বলল, তাহলে তুমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। মেয়েটি এমনি করে এসে পৌছুল তার ভাইয়ের বাড়িতে।

এদিকে বানরের সহবাসে সে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। যথা সময়ে জন্ম হল তার পুত্রের। ভাই বানর-ভাগ্নে পছন্দ করে না, তাই তার মা তাকে পাঠিয়ে দিল জঙ্গলে। ···এমনি করে এগিয়ে চলেছে গল্প।

দ্বিতীয় গল্পটি সর্প সম্পর্কিত, লুসাই পাহাড়ের। গল্পটির নাম Chhawng Shili on the Rulpui.

ছাওয়াঙ শিলি তার ছোট বোনকে নিয়ে যায় বাপের 'ঝুম'-এ। ঝুমের নীচেই একটা গাছের কোটরে থাকে একটা সাপ। ঝুমে গিয়েই ছাওয়াঙ শিলি তার ছোট বোনকে বলে সাপটাকে ডেকে আনতে। বোন ডেকে আনে সাপটাকে। বাড়ি থেকে ওরা যা খাবার আনে তা সাপটা আর ছাওয়াঙ শিলি খায়। বোন ভয়ে কাছে এগোয় না। সারাদিন বড় বোনের কোলে শুয়ে সাপটা প্রেমখেলা খেলে।

ছোট মেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখে বাপ তাকে জিজ্ঞেস করতেই সব খুলে বলল সে। বাপ বড় মেয়েকে আটকে রেখে ছোট মেয়েকে নিয়ে, কুমারীর পোষাক পরে ঝুমে গেল। আগের মতই ছোট মেয়ে সাপটাকে ডেকে আনতেই বাপ দা দিয়ে কেটে ফেলল সাপটাকে।

পরের দিন ছাওয়াঙ শিলি গেল বোনকে নিয়ে। সাপ আর আসবে কোথা থেকে? তারা বাড়িতে ফিরতেই বাপ এক কোপে বড মেয়েকে কেটে ফেলল। সাপের ঔরসে

ছাওয়াঙ শিলি ছিল গর্ভবতী। বেরিয়ে এলো অনেক সর্পশিশু। বাপ সবগুলোকে মারল। একটি পালাল। ছাওয়াঙ শিলির এই সর্পপুত্রের নাম রুলপুই।[৪৯]

জাপানের সর্প ও বানর দেবতার কাছে কুমারীবলি এবং 'ইগোরোট' যুবতীদের প্রাগুক্ত আচরণ—এই দুয়ের উৎসসূত্রে মিল থাকা সম্ভব বলেই মনে হয়।

স্বভাবতই অনেকে প্রশ্ন করবেন—তাহলে সর্প-দেবতার সঙ্গে এই ধরণের আচরণের কোনো উৎস থাকা সম্ভব কিনা? সাধারণদৃষ্টিতে সর্পের সঙ্গে মিলন চিন্তা অত্যন্ত অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু এরও উল্লেখ আছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তে। গ্রন্থটির কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি।

> শবলা নাগিনী-কন্যা, পাঁচ বছর বয়সের আগে নিজের স্বামীকে খেয়ে সে প্রায় চিরকুমারী। কিন্তু আস্তানায় বা ঘরে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে স্বয়ং শিরবেদে। নাগিনী কন্যাকে যদি স্পর্শ করে ব্যভিচারের অপরাধ তবে গোটা বেদে সমাজের মুখে কালি পড়বে। মা বিষহরি তার হাতে পূজা নেবেন না (পৃঃ ৭০)। যে বেদের ছেলের সঙ্গে তার সাদি হয় শিশুকালে নাগ দংশনে তার প্রাণটা যায়। তারপর নাগিনী কন্যার লক্ষণ ফোটে তার গায়ে—তখন সে পায় মা মনসার বারি —পায় তার পূজার ভার কিন্তু পতি পায় না হতভাগিনী (পৃঃ ১১৯)। মা বিষহরির পূজারিণী ঐ কন্যে, ও যে অন্তরে অন্তরে নাগিনী। (...) দেহে মনে ধরে জ্বালা। রাত্রে ঘুম আসে না চোখে। মাটির উপর পড়ে অকারণে কাঁদে। হঠাৎ মনে হয় যেন কে কোথায় শিস দিচ্ছে (পৃঃ ১১২)। মধ্যরাত্রে শেয়াল ডেকে গেল। বেদিনীর অন্তরটা যেন কেমন করে উঠল। (...) ঠিক এই-ক্ষণটিতে নাগিনীকন্যার অন্তরের মধ্যে কালনাগিনী স্বরূপটি নিয়ে জেগে ওঠে। কিন্তু বিছানার খুঁট ধরে দাঁতে দাঁত টিপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকতে হয় নাগিনীকন্যাকে। এই নিয়ম। (পৃঃ ১২৩)। নাগিনীর নারী ধরমের কাল আসে—তার অঙ্গ থেকে কাঁঠালী চাঁপার বাস বাহির হয়। সেই বাস ছাড়িয়ে পড়ে চারিপাশে। নাগ সেই গন্ধের টানে এসে হাজির হয়। দুজনে মিলন হয়, খেলা হয়, জীব ধরমের অভিলাষ মেটে, নাগ নাগিনী অভিলাষ মিটিয়ে চলে যায় আপন আপন স্থানে। ভালবাসা তো নাই সেখানে। কিন্তু নাগিনীকন্যে যখন মানুষের রূপ ধরে মানুষের মন পায়—তখন দেহের অভিলাষ মিটলেই মনের তিয়াস মেটে না, মন চায় ভালবাসা (পৃঃ ১৩৭)।

৪৯. S. N. Barkataki : Tribal Folk-Tales of Assam, Gouhati 1970' pp 71-72 & 4-041

নাগিনীকন্যা প্রকৃত প্রস্তাবে মা মনসার মন্দিরের দেবদাসী। বেদেসমাজে যে মেয়েকে বিষহরির পূজারিণী করার জন্য নাগিনীকন্যা করা হয়, তাকে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বলি দিতে হয়। তাকে ভাবতে শেখানো হয়, সে মানবী নয়, নাগিনী। তাই যখন তার কামনা জাগে তখন কি সে নাগিনী হিসাবেই নাগের সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখে? 'অঙ্গটা মোর জল্যা যেছে গো, জল্যা যেছে। মনে হছে হিজল বিলে, কি মা গঙ্গার বুকের পরে অঙ্গটা এলায়ে দিয়া ঘুমায়ে পড়ি। কিম্বা—লাগগুলাকে বিছায়ে তারই শয্যে পেতে তারই পরে শুয়ে ঘুমায়ে যাই (পৃ ১১০)।' জীবধর্মের তাড়নায় নাগিনী নাগের সঙ্গে মিলিত হয়ে তৃপ্তি পায়। কিন্তু, মানবী-নাগিনীকন্যার পক্ষে তো সে ধরণের মিলন সম্ভব নয়। তাই নাগের দেহস্পর্শে সে নিজের জ্বালা প্রশমিত করতে চায়। জাপানী গল্পে সর্পদেবতার কাছে কুমারী উৎসর্গের সঙ্গে নাগিনীকন্যার নাগের কাছে আত্মোৎসর্গের চিন্তার মৌলিক প্রকৃতি ভিন্ন না-ও হতে পারে।

প্রসঙ্গত আসে বলির কথা। মনে হতে পারে, 'বলি' অর্থ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে হত্যা। কিন্তু পরে যখন হত্যার প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হবে, তখন মনে হয়, এখনকার আপাত-অসঙ্গতির ধারণা আর থাকবে না।

কোরীয় রাজসমাধির উপর একই সঙ্গে নরনারী বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।[৫০]

কুমারীবলির চিত্র পাওয়া যায় নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও। তাদের 'যৌবন-দীক্ষা' (পিউবারটি রাইটস্) অনুষ্ঠানের তরুণ-তরুণী যুগলের বলিতে আরও আদিমতার ছাপ রয়েছে।

এই অনুষ্ঠানের শেষ কয়েক দিনে শুরু হয় অবাধ যৌন-মিলন। সঙ্গে থাকে তাদের পুরাণ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উচ্চনিনাদ। অনুষ্ঠানের শেষ রাতে একটি সুন্দরী তরুণীকে তৈলসিক্ত করে বিচিত্র রঙ এবং উৎসব সাজে সাজিয়ে নাচের জায়গায় নিয়ে আসা হয়। এখানে আগে থেকেই তৈরি করা একটি কাঠের মঞ্চের নিম্নাংশের ফাঁকা জায়গাটিতে মেয়েটিকে শায়িত করে উৎসবের উদ্যোক্তারা একের পর এক তার সঙ্গে মিলিত হয়। সবশেষে মিলনের জন্য আগে থেকেই একটি তরুণকে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। তরুণটি যখন মেয়েটির সঙ্গে মিথুনাবস্থায় থাকে তখন ঝাঁকুনি দিয়ে সেই ভারি মঞ্চটিকে তাদের উপর ফেলে যুগলকে পিষে মেরে ফেলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের উচ্চনিনাদ এবং সমবেত জনতার যৌথ-

৫০. Encyclopaldia of Religion & Ethics.

উল্লাস হতভাগ্য যুগলের অন্তিম আর্তনাদকে ডুবিয়ে দেয়। এরপর শব দুটোকে টেনে বের করে টুকরো টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলা হয়।[৫১]

বলির নর-শবদেহকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবার রীতি মেকসিকো রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।[৫২] ভারতবর্ষে নরমাংসের বিক্রয়ের প্রথা যে ছিল তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। প্রশ্ন জাগে, নিউগিনির এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাণীর মিলনঋতুতে তাদের হত্যা করে পুড়িয়ে খাওয়ার প্রাগৈতিহাসিক আদিম জীবনযাত্রার ছাপ কি নেই?

ঠিক একই ধরণের অনুষ্ঠান ছিল আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে নূতন রাজার অভিষেককালে। একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যাক।

পুরনো রাজার মৃত্যুর পর থেকে নতুন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত কোনো পবিত্র আগুন রাজ্যে জ্বলবে না। অনুষ্ঠানের দিন এই আগুন জ্বালানো হত অরণি-ঘর্ষণজাত স্ফুলিঙ্গ থেকে। (বৈদিক ভারতে যেমন, ঠিক তেমনি আদিম পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে একটি কাঠের গর্তে অন্য একটি কাষ্ঠদণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঘূর্ণনের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদনের রীতি প্রায়ই দেখা দেখা যায়)। অভিষেকে সমাগত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকের হাতেই অরণিযুগল। আগে থেকেই নির্বাচিত এক নব তরুণ-তরুণী যুগলকে সভায় এনে সম্পূর্ণ নগ্ন করা হবে। তাদের জীবনের প্রথম মিলনই হচ্ছে এই পবিত্র আগুনের প্রতীক। একই ধরণের অগ্নির ধারণা বৈদিক ধর্ম চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়। রমণীর দেহে শোণিতরূপে অগ্নি অবস্থান করে। পুরুষের তেজ-শুক্র সংযোগেই ঐ শোণিতে উর্বরতাশক্তি জন্মে। তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়।[৫৩] দেহস্থ অরণিতে যখন তারা আগুন জ্বালবে ঠিক তখনই জনতার হাতের অরণিযুগলের ঘর্ষণেও 'পবিত্র আগুন' জ্বলে উঠবে। তরুণ-তরুণী যুগলের মিথুনাবস্থায় তাদের আগে থেকে তৈরি করা একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে সমাহিত করা হয়।[৫৪]

উভয়ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পূর্বে মিলন। প্রথম ক্ষেত্রে শবদেহকে পুড়িয়ে খাওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মাটিতে পুঁতে দেওয়া। এই মিলন, মৃত্যু, পোড়ানো, মাটিতে

৫১. J. Campbell : The Masks of God : Primitive Mythology, London 1963, pp. 170-71

৫২. Sex and Sex Worship : Ibid. P. 227.

৫৩. রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব, এম. এ: হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি শৈবধর্ম (রুদ্র শিবোপাসনা)। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, যাদবপুর, কলিকাতা ১৩৫৩ পৃ. ১২।

পুঁতে দেওয়া—এ সমস্তকিছুই আমাদের পশুপক্ষি-শিকারজীবনের কথা কি স্মরণ করিয়ে দেয় না? মনে করিয়ে দেয় না—'মা নিষাদ……' শ্লোকের উৎপত্তি ও মৈথুন ও মৃত্যুর ক্ষণটিকে? সেখানে আমরা ক্রৌঞ্চীর বিচ্ছেদ-বেদনায়, আদি কবির মুখ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত অভিশাপ শ্লোকের করুণবিধুর ধ্বনিতে মুহ্যমান হয়ে থাকি। ইত্যবসরে কিন্তু ব্যাধ অভিশাপকে উপেক্ষা করে নিহত শিকারকে পুড়িয়ে খাবার উদ্যোগ নেয়। শিকারের বিচিত্র কৌশলগুলির অন্যতম গর্তে ফেলে দেওয়া অথবা শিকারকে পড়ে যেতে সাহায্য করা। হস্তি-শিকারে এ কৌশল এখনও প্রযুক্ত হয়। পুরাকালেও যে ছিল তার প্রমাণ গর্তে পড়ে-যাওয়া শিয়াল এবং ছাগলের উপকথাটি। শিকারের প্রকৃষ্টতম ঋতু বিভিন্ন প্রজাতির, পশুপাখির মিলনকাল, মুহূর্তগুলি। তারই সঙ্গে এদের হত্যা বা জীবন্ত ধরার পদ্ধতিগুলি আবিষ্কৃত। একেবারেই বধ না করে জ্যান্ত কবর দিয়ে মেরে ফেলার পারস্য রীতি (আগেই উল্লিখিত) আমাদের দেশে সেদিন পর্যন্তও ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে: হাকিম অর্থাৎ মুসলমান চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্যের জন্য তাহাকে ছয় মাসের পাঁঠা না কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া পরে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতে পরামর্শ দেন।[৫৫] শ্বাসরোধ করে হত্যা বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম মানসিক লক্ষণ।[৫৬]

এবার নিউগিনির পাশের অন্য একটি দ্বীপ পশ্চিম-সেরাম-এর একটি পুরাণ কাহিনী বলছি।

আদিকালে নুনুসাকু পাহাড়ে কলাগাছের খোসা থেকে জন্মেছিল নটি মানব পরিবার। এরা এসে জুটল অহিওলা আর ভেরোলাইনের মধ্যবর্তী জঙ্গলে জায়গা—'নব নৃত্যের মাঠ' বা 'নাইন ডানসেস্ গ্রাউণ্ড'-এ।

লোকগুলির মধ্যে একজনের না ছিল সংসার, না ছিল ছেলেপুলে। আমেতা নামে এই লোকটি একদিন কুকুর নিয়ে বেরুল শিকার করতে। কুকুরটা তাড়া করল একটি শূকরছানাকে। সেটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমেতা বাচ্চাটাকে তুলে আনতেই দেখল সেটার গজদন্তের উপর একটা নারকেল। স্বপ্নে দেখা এক দেবতার আদেশে নারকেলটা সে মাটিতে পুঁতে দিল। তিনদিনে গাছ গজাল।

---

৫৪. The Masks of God : Ibid. P. 169.

৫৫. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়: বধু দিগম্বরী ও বাবু দ্বারকানাথ। দেশ ২২শে এপ্রিল ১৯৭৮, কলকাতা। পৃঃ ১৫

৫৬. নৃপেন্দ্র গোস্বামী: বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। কলকাতা ১৩৭৫। পৃঃ ৬৮।

আর তিনদিনেই ফুল। ফুলের ঝাড় থেকে পানীয় (মদ ?) তৈরীর জন্য আমেতা উঠল গাছে। ঝাড় কাটতে গিয়ে কেটে গেল তার আঙ্গুল। ঝাড়ের রসের সঙ্গে কাটা আঙ্গুলের রক্ত মিশে এক ফোঁটা পড়ল পাতার উপর। আরও তিনদিন বাদে সেখানে দেখা দিল টুলটুলে একখানা মুখ। এবং তিনদিনে তৈরি হল ছোট্ট একটি মেয়ে। বেতাল মহারাজ বলির আঙ্গুল চান। আমাদের উল্লিখিত অগাষ্টাস সোমারভিলের কুমারীবলির কাহিনীতেও সাধুবাবার কাছে রুকমনের কাটা আঙ্গুলের রক্ত রুটিতে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। অন্যদিকে এই মেয়েটির জন্ম পাতার উপর পুরুষের আঙ্গুল কাটা রক্তে। "বেগুন এবং বেগুনপাতা দেখিয়া কেন সে সদ্যপ্রসূত শিশু-সন্তানের কথা মনে হয়, তাহা মনোবৈজ্ঞানিকগণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিবেন।"[৫৭]

পাতার সঙ্গে প্রজননচিন্তার একটি বিশেষ সম্পর্ক লোকচিন্তায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে।

রাত্রিবেলা আবার দেবতা এসে আদেশ করলেন: সাপের মত করে জড়াও তোমার পরবার কাপড়; তাতে করে মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে এসো।

মেয়েটির নামকরণ করা হল হেইনুউয়েলি। তিনদিনে ঋতুমতী হল সে। এবং অসাধারণ এই মেয়েটি প্রকৃতির ডাকে (ইউরিনেট) সাড়া দিলেই তা থেকে জন্ম নেয় চীনেমাটির বাসনকোসন, পেটাঘড়ির মতন দামী জিনিসপত্র। বড়লোক হয়ে গেল আমেতা। আর এসে গেল এই 'ডেমা' জনগোষ্ঠীর 'মাবো' নাচের সময়।

অদ্ভুত সুন্দর এই নাচ। কেন্দ্রে থাকবে একটি কুমারীকন্যা। তাকে ঘিরে নাচবে মেয়েরা। মেয়েদের ঘিরে নাচবে পুরুষের দল। কেন্দ্রের কুমারীকন্যা প্রত্যেক নাচিয়েকে সুপুরি দেবে। ন'রাত্রি ধরে ন'টি বিভিন্ন জায়গায় বসবে নাচের আসর।

হেইনুউয়েলি সেই নির্বাচিত কেন্দ্র-কুমারী। প্রথম রাত্রে সে দিল সুপুরি, দ্বিতীয় রাত্রে প্রবাল। তৃতীয় রাত্রে নাচিয়েরা তার কাছ থেকে পেল একখানা করে চীনে-মাটির থালা। চতুর্থ রাত্রে আরও বড় থালা এবং পঞ্চমে জঙ্গলকাটা বড় ছুরি। ষষ্ঠ রাত্রে তার উপহার সুপুরি রাখবার নক্শা করা বাক্সো, সপ্তমে সোনার কানের দুল। অষ্টম রাত্রে উপহারের বস্তু হিসেবে সে দিল মিষ্টি আওয়াজ

৫৭. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড। কলকাতা ১৯৬৩। পৃঃ ৫৪৭।

কব্বা পেটাঘড়ি। এদিকে এইসব মূল্যবান উপহার দেখে ন'টি পরিবারের লোকই ঈর্ষা করতে শুরু করেছে আমেতাকে। আর এজন্যই নবম রাত্রে নাচের সময় দলের লোকগুলো সবাই মিলে আগে থেকে খুঁড়ে রাখা একটা গর্তের মধ্যে হেইনুউয়েলিকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

এদিকে মেয়ে ফিরছে না দেখে রাত্রিশেষে আমেতা এল নাচের জায়গায়। খুঁড়ে বের করল মৃতদেহ। কেবল হাত দু'খানা রেখে সমস্ত দেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দিল সে নাচের জায়গায়। হাত দু'খানা উপহার দিল তাদের কুমারীদেবী 'সাতেন'কে। দেবী 'সাতেন' কিন্তু এই কুমারীকন্যা হেইনুউয়েলির হত্যায় অসন্তুষ্ট এবং ডেমাদের উপর ক্রুদ্ধ হলেন।[৫৮]

এই পুরাণকাহিনীতে কুমারীহত্যার কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। এ বলির আপাতদৃষ্ট কারণ ঈর্ষা। কিন্তু একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, আদি কাহিনীটি বর্তমান রূপে না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, আমরা দেখেছি কন্যার হত্যায়, পিতা হিসাবে আমেতার মনে কোনো শোকের উদয় হয়নি ; গোষ্ঠীর লোকেদের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহার কোনো ক্ষীণতম আভাস নেই কাহিনীর কোথায়ও। বরং নির্বিকল্পভাবে কন্যার শবদেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছে সে নাচের জায়গায়। (এই ধরণের উর্বরতা-প্রতীক অনুষ্ঠান আমরা পরেও দেখবো)। হাত দুটো দিয়েছে কুমারী-দেবী সাতেনকে (অন্যত্র আঙ্গুল এখানে পুরো হাত)। মনে হয়, মূল কাহিনীটি নাচের অনুষ্ঠান শেষে মাটি চাপা দিয়ে কুমারী-দেবী সাতেন-এর কাছে কোনো কুমারীবলির এবং তার অঙ্গ উৎসর্গের ঘটনাই ছিল। পরবর্তীকালে নানাবিধ মিলন-মিশ্রণের ফলে কাহিনীর রূপান্তর ঘটেছে, বর্তমান অবস্থায় এসেছে। বর্তমান কাহিনীতে দেবী সাতেন এই হত্যায় অসন্তুষ্ট (ভারতীয় ধর্মচিন্তায় অঘোরপন্থীদের কুমারীবলিও পরবর্তীকালের তন্ত্র-সাধনায় স্বীকৃত হয়নি)।

এই কাহিনীতে কয়েকটি লক্ষণীয় দিক আছে। প্রথমত, ফুলের ঝাড়ের কষ এবং পুরুষের আঙুলের রক্তে কন্যার জন্ম। অর্থাৎ এই দেশের চিন্তায় পুরুষের আঙ্গুলের রক্ত প্রজনন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত (আমাদের দেশের রূপকথায় ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর চোখ ফোটাতে পারে একই রক্ত)।[৫৯] আঙ্গুল বা ক্ষেত্রবিশেষে

৫৮. The Masks of God: Ibid.pp.568-69.

৫৯. দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার : ঠাকুরমার ঝুলি (নীলকমল লালকমল গল্প)।

হাত এই ধরণের চিন্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তার প্রমাণ মিলবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেওয়াল-চিত্র, এমনকি গুহায় প্রাপ্ত হাতের ছাপে। বর্তমান ভারতেও বিভিন্ন লোকসমাজে এই হাতের ছাপের রীতি প্রচলিত। হিন্দুর কোনো কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পিতৃপুরুষের তর্পণ করার রীতি আছে। বিবাহ অন্নপ্রাশন এবং উপনয়নে এই রীতি বর্তমান। এর সংস্কৃত নাম আভ্যুদয়িক; বাংলায় আভ্যুদিক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অথবা শুধু 'বৃদ্ধি' (বিদ্দি) বলা হয়। যে জায়গায় এই অনুষ্ঠান হয় সেই ঘরের দেওয়ালে গোবরের একটা ড্যালা পিঠে বা ঘুঁটের আকারে লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেটিকে হাত দিয়ে এমনভাবে দেওয়ালে চেপ্টে দেওয়া হয় যাতে পাঁচটি আঙ্গুলেরই ছাপ সুস্পষ্ট থাকে। এবার পাঁচটি কড়িকে চিৎ করে তার উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। কড়ি প্রাচীনকাল থেকেই আকৃতির জন্য প্রজনন চিন্তাব সঙ্গে যুক্ত। এবার কড়িগুলোর ওপরে (কখনো বা নিচে) পাঁচ আঙ্গুলের প্রতীক পাঁচটি ফোঁটা সিঁদুর এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে ঐ রক্তিম তরল পদার্থটি নিচের দিকে পাঁচটি প্রবাহের মত পড়ে। বঙ্গদেশের প্রায় সব জায়গায়ই সিঁদুরের ফোঁটা থাকলেও উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে পুরো পাঞ্জার ছাপই সিঁদুর দিয়ে দেওয়া হয়। কোথাও বা একটি ডিঙ্গি নৌকো সিঁদুর দিয়ে এঁকে তার তলায় পাঁচটি ফোঁটা দেওয়া হয়। বঙ্গেতর প্রদেশবাসীরা অনেকসময় এই ফোঁটা এবং তার ধারা ঘি দিয়ে করে থাকেন।

বৌদ্ধযুগের ভারতে এই পঞ্চাঙ্গুলিকের সাহায্যে বৃক্ষপূজা করা হত। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কুমার জম্বুদ্বীপের সহস্ররাজাকে বন্দী করেও তক্ষশীলা জয় করতে পারেননি। জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি পুরোহিতের পরামর্শ নিলেন। পুরোহিতের প্রস্তাব—'মহারাজ এই সহস্ররাজার চক্ষু উৎপাটন করুন, ইহাদের কুক্ষি বিদারণপূর্বক পঞ্চবিধ মধুর মাংস লউন; তাহা দ্বারা এই বটবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করুন; অন্ত্রগুলি দ্বারা মালার আকারে বৃক্ষটিকে বেষ্টন করুন; রক্তদ্বারা ইহার কাণ্ডে পঞ্চাঙ্গুলিক দিন; তাহা হইলে অচিরেই আমাদের জয় হইবে।'[৬০] গবাদি পশুর অঙ্গসজ্জা অথবা হন্যপশু বা প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পঞ্চাঙ্গুলিক সজ্জিত করার প্রথা 'মৃতকভক্ত' প্রমুখ একাধিক জাতক কাহিনীতে লক্ষ করা যায়। ব্যবহারের বিচিত্র দিকগুলি ফলতই এর মূল উদ্দেশ্য তথা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

৬০. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত জাতক, ধোনসাখ-জাতক (৩৫৩ নং) ৩য় খণ্ড। কলকাতা ১৩৮৫। পৃঃ ৯৫।

লৌকিকচিন্তার উৎসে আঙ্গুল সোজাসুজি-ই প্রজনন চিন্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ব্রেজিলের লোককথায় আছে যে হাতের আঙ্গুলের হাড় খেলে গর্ভসঞ্চার হয়।[৬১]

জাতকের কাহিনীতে আঙ্গুলের হাড় খাওয়া নয়, স্পর্শেই গর্ভসঞ্চার সম্ভব। "শক্র [···] তাঁহাকে (শীলাবতীকে) [···] লইয়া শয়নকক্ষে প্রকাশপূর্বক রাজার সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইলেন এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার নাভি স্পর্শ করিলেন। বোধিসত্ত্বও তন্মুহূর্তে তাহার গর্ভে জন্মান্তর গ্রহণ করিলেন।"[৬২] প্রজননে হস্ত অঙ্গুলি নাভি ইত্যাদির স্থান বৈদিক-চিন্তায় কোথায় কিভাবে এবং কেমন জানতে হলে উৎসাহী পাঠকের 'পুরোহিত দর্পণ' বা 'ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি' জাতীয় গ্রন্থ থেকে গর্ভাধানের মুদ্রাসহ মন্ত্রগুলো পড়ে নিতে অনুরোধ করছি।

ঔপনিষদিক ভারতেও এই চিন্তাধারা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১. ৪. ৬-সংখ্যক মন্ত্রটির কিছু অংশ এইরকম :

> অথ ইতি অভি অমন্থয়ৎ। স মুখাৎ চ যোনেঃ হস্তাভ্যাম্ চ অগ্নিম্ অসৃজত্। তস্মাৎ এতৎ উভয়ম্ অলোমকম অন্তরতঃ। অলোমকা হি যোনিঃ অন্তরতঃ। তৎ যৎ ইদম্ আহুঃ অমুম্ যজ অমুম্ যজ ইতি। একম্ একম্ দেবম্ এতস্য এব সা বিসৃষ্টিঃ। এষঃ উ হি এ সর্বে দেবাঃ অথ যৎ কিম্ চ ইদম্ আর্দ্রম্, তৎ রেতসঃ অসৃজতঃ। তৎ উ রোমঃ। (পাঠের সুবিধার্থে সন্ধিবিযুক্ত অংশ গৃহীত)।

অর্থাৎ অনন্তর (ঋষি হস্তদ্বারা দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রজাপতি) এইরূপে মন্থন করিয়াছিলেন। মুখরূপ যোনি হইতে (মুখাৎ চ যোনেঃ—এটি সমাসবদ্ধ পদ নয়; তাই এই ধরণের অনুবাদ কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়) এবং হস্ত হইতে তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। এইজন্য যে মুখ (?) এবং হস্ত উভয়েই অভ্যন্তরে লোমবিহীন, কারণ যোনির অভ্যন্তর লোমবিহীন। লোকে যে বলিয়া থাকে 'অমুক দেবতার যজ্ঞ কর' 'অমুক দেবতার যজ্ঞ কর,' এক একজন দেবতা সেই প্রজাপতিরই সৃষ্টি; ইনিই সেই সকল দেবতা। যাহা কিছু আর্দ্রবস্তু, তাহা তিনি শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৬১. SDFM & L (Vol 2) P. 661.

Magical impregnation may occur in many ways : from eating finger bones (twins are born when two finger bones are eaten in a Bakairi Central Brazil tale).

৬২. কুশজাতক (৫৩১ নং)। জাতক, ৫ম খণ্ড। পৃঃ ১৭০।

ইহাই সোম।[৬৩] এখানেও হাতকে স্পষ্টতই সৃষ্টিচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর বৈদিক দৃষ্টিতে অগ্নি কি, তা আমরা আগেই দেখেছি।

হাতকে কর্মের তথা সৃষ্টির প্রতীক বলা হয়। মৃতজীবদের প্রধান কর্মসাধনের প্রতীক হস্তসমূহে নির্মিত কাঞ্চী বিরাটরূপিনী মহাদেবীর গর্ভধারণের যোগ্য নিম্নোদর তথা যোনির উর্ধদেশে কটিতে কল্পিত। কারণ এই ধ্বংসের পরেই সৃষ্টি। কর্পূরাদি স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকে বিমলানন্দস্বামী এই ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এছাড়া অপরাজিতা প্রমুখ, তন্ত্রমতে যেমন যোনিপুষ্প, তেমনি করবী লিঙ্গপুষ্প নামে চিহ্নিত। করবী শব্দটির মধ্যে 'কর' শব্দটি প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে। অন্য দিকে করবীরা শব্দের অর্থ পুত্রবন্তী নারী।

হেইমুউয়েলির কাহিনীর দ্বিতীয় দিক হচ্ছে—নারীর যৌবন-সংকেতকালীন 'প্রকৃতির আহ্বান' জীবকূল-সৃষ্টির সংকেতে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ না থেকে পার্থিব সমস্ত রকমের মূল্যবান সম্পদ-সৃষ্টির সংকেতরূপ পরিগ্রহ করেছে। (নবযুবতীব 'প্রকৃতির ডাক' আবার ইতালীতে সৃষ্টির বদলে ধ্বংসের ইঙ্গিতরূপে চিহ্নিত হয়—ঋতুমতী নাবীর মূত্র যে কোনো ফুলকে শুকিয়ে দিতে পাবে)।[৬৪] যা-ই হোক, এই গল্পে হেইমুউয়েলির হত্যা—মানব সন্তান, পশুশাবক তথা আদিম পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার বংশবৃদ্ধি করবার এবং সমস্ত রকম সম্পদ সৃষ্টির উৎসভূমিকে হত্যার (যদিও একমাত্র শেষেরটি বাদ দিয়ে অন্য কোনোটির উল্লেখ এখানে নেই) প্রতীক। তাই দেবী সাতেন এই হত্যায় অসন্তুষ্ট। যেহেতু কৃষিবিষয়ক কোনো কথাই এখানে নেই, তাই কৃষিসভ্যতার যুগে এদের জন্ম, এমন ভাবনা পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রসঙ্গটি এইজন্য তোলা হল যে, অনেকে এই ধরণেব কাহিনীকে কৃষি-চিন্তাজাত বলে ব্যাখ্যা করেন অনেক সময়।

এবার আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দুটি কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পেরু-মেক্সিকোর পুরাণে বর্ণিত আছেঃ ভুট্টার ছড়া দিয়ে তৈবি হয় 'ছড়া-মা'র মূর্তি। পুজোতে দেবীর সামনে রচনার হাড়িতে সাজিয়ে দেওয়া হয় নানারকমের খাবার। আর রাখা হয় একটি সেদ্ধ করা ব্যাঙ (এটি জল-দেবতার স্ত্রীরূপে কল্পিত)। এই সেদ্ধ করা ব্যাঙের পিঠের ওপর রাখা হয় ভুট্টাখোলার ভেতর ভর্তি করে ভুট্টা ছোলা মুগ ইত্যাদির গুঁড়ো।

৬৩. উপনিষদ, ২য় খণ্ড। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৭৭। পৃঃ ২০৭

৬৪. SDFM & L (Vol 2) P. 706.

একটি কুমারী মেয়েকে সুদৃশ্য সাজে সাজিয়ে তাকেই দেবীজ্ঞানে পূজো করেন পুরোহিত। এই সময়ে মেয়েরা নাচে নরবলির নাচ। এরপর এই জীবন্ত দেবী অর্থাৎ কুমারী মেয়েটিকে বলি দিতে তার রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটি রান্নার হাড়িতে বসিয়ে 'ছড়া-মা'র অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হয়। যদি এমন বোঝা যায় যে দেবী সন্তুষ্ট হন নি, তবে নতুন করে পূজোর বন্দোবস্ত করা হয়।[৩৫] এবং সেক্ষেত্রে আরও একটি কুমারীর বলি।

দ্বিতীয় কাহিনী ফ্রে বার্নাডিনো দ্য সহগুন-এর লেখা। জে. জি. ফ্রেজার এটির উল্লেখ করেছেন তাঁর 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে।

চিকোমেকোহুয়াত্‌ল আজটেক্‌দের ভুট্টাদেবী। প্রতি সেপ্‌টেম্বরে (শরতে) এঁর পূজো। পূজোর সাতদিন আগে থেকে ভক্তরা উপোস করবে। পূজোয় দাস (স্লেভ) পরিবার থেকে একটি কুমারীকন্যাকে বেছে নিয়ে তাকে ভুট্টাদেবীরূপে সাজাবে। এই জীবন্ত দেবীকে নিয়ে সারাদিন ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরবে লোকেরা। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মন্দিরে জ্বলে উঠবে অসংখ্য আলো; বেজে উঠবে বাঁশির সঙ্গে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। এ রাত্রি জাগরণের রাত্রি।

মধ্যরাত্রে ভুট্টার ছড়া, কুমড়ো, লঙ্কা, বিভিন্ন ধরণের দানাশস্য আর গোলাপ দিয়ে সাজানো একটি মঞ্চ বাহকেরা মন্দিরে বয়ে নিয়ে আসবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে ভুট্টাদেবীর দারুময়ী মূর্তি। মন্দিরের ভেতরে আর বাইরে অজস্র ফুলের মালা, মেঝেতে নানান উপহার।

বাদ্যধ্বনি থেমে যাবে। জীবন্ত ভুট্টাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে ঢুকবে ধূপদীপ হাতে পুরোহিত এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। দেবীকে তারাই স্থাপন করবে মঞ্চের ওপর। আবার বাজনা বাজবে। ধূপারতি করবে পুরোহিত জীবন্ত দেবীকে। মন্দিরের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষুর দিয়ে মেয়েটির মাথার চূড়া-সমেত চুল কেটে নিয়ে মন্ত্র পড়ে সাশ্রুনয়নে সেটাই উৎসর্গ করবে দারুময়ী দেবীকে। সঙ্গে চলবে সমবেত প্রার্থনা। এরপর মেয়েটিকে নামিয়ে আনা হবে মঞ্চ থেকে এবং অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। আলো জ্বেলে মন্দিরে চলবে প্রহরা।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব। মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে উঠবে অগণিত ভক্ত-জনতায়। হতভাগিনী কুমারীদেবীকে

৩৫. নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য: লক্ষ্মী—আশা থেকে আশ্বিনে। কলকাতা ১৩৭৪। পৃ: ৩০।

মন্দিরে এনে পুরোহিত আবার তুলে দেবে তাকে মঞ্চে। মন্দিরের প্রাঙ্গণেই আছে হুইট্‌জিলোপোক্‌ত্‌লি-দেবের মন্দির। সেই মন্দির ঘুরিয়ে আনা হবে জীবন্ত ভুট্টাদেবীকে।

দারুময়া দেবীমূর্তির সামনে যে দানশস্যের নৈবেদ্য সাজানো আছে, তার সামনে দাঁড় করানো হবে মেয়েটিকে। সাতদিন ধরে উপবাস পালনের মধ্যে ভক্তরা নিজেদের কান ফুটো করে যে রক্তের অর্ঘ্য সঞ্চয় করেছে, তা নিয়ে আসবে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, উপহার দেবে জীবন্ত দেবীকে অবনত মস্তকে। এরপর রক্ত দেবে নারীসমাজ। এই অনুষ্ঠানের পর সবাই ফিরে যাবে নিজের ঘরে। খাওয়া-দাওয়া সেরে একে একে ফিরবে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

আবার চলবে কুমারীদেবীর ধূপারতি। আরতির শেষে কুমারীদেবীকে পুরোহিত ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে দানাশস্যের ওপর ফেলে দিয়ে তার গলা কেটে দেবে। ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত ধরে রাখবে একটা পাত্রে, তারপর ছড়িয়ে দেবে দানাশস্যে, স্তূপীকৃত শাকসব্জীতে, মন্দিরে আর কাঠের দেবীমূর্তিতে।

এরপর পুরোহিত মেয়েটির চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে, তার দেবী-সজ্জাসমেত সেটি নিজের গায়ে জড়াবে। শুরু হবে সমবেত নৃত্য।

রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রাগুক্ত দু'টি অনুষ্ঠানই একটি নির্দিষ্ট চিন্তার প্রায় একই ধরণের ফসল। উভয়ক্ষেত্রেই বলির কুমারীটি আরাধ্যা দেবীর মানবী সংস্করণ। উভয়েই সদ্য-কৈশোরপ্রাপ্তা। ভারতীয় চিন্তায় তান্ত্রিকদের কাছেও কুমারী আরাধ্যদেবী। অঘোরপন্থীরা এঁকেই বলি দিত। আবার দুর্গোৎসবে মহানবমী তিথিতে বা তান্ত্রিক উপাসনা ক্ষেত্রে বা নেপালে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে ইনিই পূজিত হন। তন্ত্রোক্ত দেবী 'ছিন্নমস্তা' এই দ্বিবিধ চিন্তার সম্মেলনের ফসল কিনা সে ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করা যেতে পারে।

আমরা যদি সুদূর অতীতে ফিরে যাই তবে হয়তো রেড ইণ্ডিয়ানদের মতনই, ভারতেও পূজা ও বলি একই সঙ্গে দেখতে পাবো। অন্তত পশুর ক্ষেত্রে পূজা ও বলি যে একই সঙ্গে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্রে অশ্বমেধের অশ্ব-প্রসঙ্গে।

আরও একটি দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। আজটেকদের ভুট্টাদেবীর পুজোয় ভক্তরা কান ফুটো করে দেবীকে রক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করে। ভারতে কান ফুটো করার অনুষ্ঠানের নাম কর্ণবেধ। ব্রাহ্মণদের উপনয়নে এবং সাধারণভাবে বিবাহের পূর্বে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন আগে ছিল

রামপ্রসাদের যুগে বিদ্যারম্ভের পূর্বেও এই অনুষ্ঠান হত। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে "সুন্দরের রাজ্যাভিষেক ও বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি" শীর্ষক খণ্ডে আছে :

বিদ্যাবতী সতী, প্রসবে সন্ততি, মাঘী শুক্লাত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর, রূপ মনোহর, যেমতি শারদশশী।

*   *   *   *

পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে, বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র পঞ্চশত বর্ণ চিনে॥[৬৬]

শিবায়ণকাব্যেও কর্ণবেধের উল্লেখ আছে।[৬৭]

বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাম্প্রতিককাল অব্দি কর্ণবেধ প্রথাটি সংযুক্ত ছিল। বর্তমান লেখক ছোটবেলায় এতদ্‌সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে প্রচলিত ছড়া শুনেছিলেন। ছড়াটি মনে নেই, কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল এইরকম : নববিবাহিতা তরুণী তার স্বামীকে বলছে আমার যে বিয়ে হয়েছে তার চিহ্ন (সীমন্ত ও ললাটের সিন্দুর, হাতের লোহা এবং শাঁখা) আমার সর্বশরীরে। তোমার বিবাহের চিহ্ন কি? ছেলেটি তার ফুটো-করা-কান তখন দেখিয়ে দিয়েছিল। বিবাহ তথা প্রজননের সঙ্গে কর্ণবেধের সম্পর্ক আদিম সমাজচিন্তায় কি ধরণের ছিল তার কিছু কিছু ব্যাখ্যা দু-এক জায়গায় পড়লেও মনঃপুত হয়নি। কিন্তু কর্ণমূল থেকে সোজাসুজি জীবসৃষ্টির কল্পনা যে ভারতীয় পুরাণে রয়েছে, এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।*

সে যা-ই হোক, কুমারীবলির আলোচ্য দু'টি অনুষ্ঠানেই কিন্তু এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে অতীতে এর সঙ্গে ভুট্টা অথবা কৃষিশস্য নয়, সম্পর্ক ছিল প্রাক-পশুপালন শিকার এবং পশুপালন ও প্রজনন চিন্তার। যেমন, প্রথম ক্ষেত্রে জলদেবতার সঙ্গিনী হিসাবে নির্দিষ্ট ব্যাঙ (শিকারস্তরের জলজ প্রাণী-শিকারের প্রতীক) কেবলমাত্র নিহতই নয়, তাকে সেদ্ধ করে রাখা হয়েছে অর্ঘ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে (ভুট্টা ইত্যাদির সংযোজন যে পরবর্তী স্তরের এটা বুঝতে খুব

৬৬. সাধককবি রামপ্রসাদ। ঐ। পৃঃ ৪৬৯।

৬৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ।

* প্রলয়সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্তনাগের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর কর্ণমূল হতে দুই দানব মধু ও (মধু?) কৈটভ নির্গত হয়। প্রথম অসুর উৎপন্ন হয়েই মধুপান করতে চেয়েছিল, সেইজন্য তার নাম হলো মধু। আর দ্বিতীয় কীটের মত দেখতে হয়েছিল বলে তার নাম হল কৈটভ।—(সুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান। কলকাতা ১৩৬৫)।

অসুবিধা হয় না)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, হত্যার পূর্বে ঐ মন্দিরেরই প্রাঙ্গণস্থিত পুরুষদেবতার মন্দিরে কুমারীকে ঘুরিয়ে আনা হয় কেন? দেবী যদি কুমারীই হন, তবে পুরুষদেবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? এই কুমারীদেবীকে কি পুরুষ-দেবতার দয়িতা কল্পনা করা হয়? বাস্তব হত্যার ঘটনা কি অন্য কোনো চিন্তা থেকে উৎসারিত হয়েছে? তাই যদি না হয় তবে পুরোহিত নিহত কুমারীর চামড়া গায়ে জড়িয়ে নাচে কেন? এ কি শিকারচিত্র নয়? দয়িতাবলির ঘটনা তো আমরা আরব্য রজনীর গল্পকাহিনীর সূত্রপাতেও দেখতে পাই। তবে কি এগুলো একই চিন্তার ভিন্নমুখী ফসল?

এবার পাওনিদের মধ্যে প্রচলিত একটি কুমারীবলির চিত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোনো এক বৎসরের বসন্তোৎসবে যে ১৩/১৪ বছরের মেয়েটিকে বলি দেওয়া হল, তাকে আগে থেকেই বেশ আদরযত্ন করে লালন পালন করা হয়েছিল। উৎসবের দু'দিন আগে গোষ্ঠীর মোড়ল আর যোদ্ধারা মেয়েটিকে নিয়ে বাড় বাড়ি ঘুরল। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই মেয়েটির হাতে একটা লাঠি আর একটুখানি লেই দিল। মেয়েটি প্রত্যেকবার এসব গ্রহণ করে তুলে দিল পাশের সৈনিকদের হাতে।

উৎসবের দিন, সংগৃহীত সমস্ত লাঠি আর লেই-সমেত সকলে কুমারীটিকে নিয়ে এল এক পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায়। এরপর মেয়েটির সমস্ত দেহ অর্ধেক কালো আর অর্ধেক সাদা রং করে দেওয়া হল (ভারতেও এই প্রথা ছিল, যা থেকে 'মুখে চুণ কালি মাখানো' প্রবাদটির জন্ম)। তাকে বেঁধে দেওয়া হল ফাঁসিকাঠ জাতীয় এক ফ্রেমের সঙ্গে। এরপর আগে থেকে তৈরি করে নরম আগুনের আঁচে ঝল্‌সানো হল মেয়েটিকে। তারপর তীর বিঁধে বিঁধে মেরে ফেলা হল তাকে।

প্রধান পুরোহিত এগিয়ে এসে মেয়েটির হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। দেহটা নরম থাকতে থাকতে হাড় থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে ঝুড়িভর্তি করে শস্যক্ষেত্রে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল। প্রধান পুরোহিতের দেখাদেখি দলের প্রত্যেকে গরম মাংসের টুকরোগুলো থেকে এক ফোঁটা করে রক্ত নিঙড়ে নিয়ে ক্ষেতে বোনা শস্যবীজের উপর ছড়িয়ে দিল। সবশেষে মাংসপিণ্ডগুলোকে পুঁতে ফেলার পালা।

অন্য একটি বিবরণ অনুসারে, হাড়মাংস সমেত পুরো দেহটাই পিষে লেই করে প্রচুর ফসল পাবার আশায় ভুট্টা এবং আলুবীজের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া

হয়েছিল।[৬৮] মহেঞ্জদরোর প্রাপ্ত সীলে মেয়েটির হত্যার যে চিত্র আছে তাকেও কি এমনি করা হয়েছিল?

পাওনিদের ক্ষেত্রেও কিশোরীর তপ্ত-শোণিত সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে—এটাই বিশ্বাস। (তুলনীয়, ত্রিম্বকের বেতাল মহারাজ কুমারীকন্যার তাজা রক্ত পেলে লুকানো জায়গা থেকে সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন, বন্ধ্যাকে পুত্রবতী করতে পারেন)। আরও একটি দিক লক্ষণীয়। আমাদের দেশে অম্বুবাচীতে যেমন ধরিত্রীকে ঋতুমতী কল্পনা করা হয়, পাওনিদের অনুষ্ঠানগুলিতে কিন্তু তেমন কল্পনার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়নি। নিহত কুমারীকন্যার কবন্ধ-নিঃসৃত শোণিতে ধরণীকে সোজাসুজি ঋতুমতী করে তোলার উদ্ভট আদিম (আদি নয়) চিন্তাই এই উৎসবের অনুষ্ঠানরীতিতে প্রচলিত ছিল। সৃজন-শোণিতের পরিবর্তে কবন্ধ-নিঃসৃত রুধির কেমন করে উর্বরতার প্রতীক হল, তা পরে বলছি। এখানে শুধু আমাদের দেশের একটি পূজায় রুধির অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গ করার বিশেষ রীতির উল্লেখ করছি। তা থেকেই বোঝা যাবে, বর্তমানে কণ্ঠরুধির দেওয়া হলেও, মূলে তা ছিল না।

> বাংলার লৌকিক দেবী রাজবল্লভীর সামনে বলির মেষ ছাগলের রক্ত উৎসর্গ করার জন্য একটি বৃহদাকৃতি খর্পর পাকাপাকিভাবে আছে। এটি দেখতে অগ্নি-কুণ্ড বা গৌরীপট্টের মত। এর তলদেশে একটি স্ত্রীচিহ্ন অঙ্কিত আছে। এরই ওপরে ঝুলন্ত অবস্থায় পশুকে বলি দেওয়া হত। বর্তমানে রক্তের পরিবর্তে মাসকলাই যব আদা মধু প্রভৃতি দেওয়া হয়।[৬৯]

আজকের মাসকলাই যব আদা মধু প্রভৃতি দেখে কেউ যদি এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে রাজবল্লভীর পূজাচিন্তার উৎসে ছিল কৃষিচিন্তা, তাহলে তার মত বড ভুল বোধ-হয় খুব কমই হবে। গৌরীপট্টে আশ্রিত রক্ত কি প্রজনন শোণিত নয়?

একই ধরণের গৌরীপট্ট তৈরি করা আছে মেদিনীপুর শহরে মিঞাবাজারের কাছে গয়লাপাড়া বলে পরিচিত অঞ্চলে একটি দুর্গামণ্ডপের সামনে। পাশেই একটি বেদীর উপর উপবিষ্ট একটি ষণ্ডমূর্তি।

রেড ইণ্ডিয়ান সভ্যতার বলি-বস্তু একটি করে কুমারী। রাজবল্লভীর পূজায় ছাগ জাতীয় পশু। ভুট্টা (কুমারী) দেবীর রক্ত যায় ভূগর্ভে শস্যবীজের সঙ্গে তাকে উর্বরতা দানের জন্য। রাজবল্লভীর ক্ষেত্রে পশুর কবন্ধরুধির গৌরীপট্টে দেবীর

৬৮. The Golden Bough. Ibid, PP. 568-69.

৬৯. লক্ষ্মী: আশা থেকে আশ্বিনে। ঐ। পৃঃ ৩০।

অর্ঘ্যরূপে, ভুট্টাদেবীর ক্ষেত্রেও দারুমূর্তিতে। আদিমতম চিন্তা উভয়ক্ষেত্রেই এক নয় কি? পুনরুক্তি হলেও বলতে হয়, প্রথম কাহিনীর সেদ্ধ ব্যাঙ, দ্বিতীয় কাহিনীর বলির চামড়ায় পুরোহিতের গাত্রাবরণ, তৃতীয়টিতে বলিকে জীবন্ত ঝলসে পোড়ানো, তীরে বিঁধে বিঁধে মারা, হৃৎপিণ্ড খেয়ে ফেলা—এই সমস্ত আনুষ্ঠানিক দিকগুলো কি কৃষিচিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? না-কি এগুলো আদিমতম জীবনযাত্রার জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল? এ সব প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আর দু'টি বলি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করি।

(১) পশ্চিম আফ্রিকার এক রানী মার্চমাসে কোদালকাটা করে একজোড়া নারী পুরুষ বলি দিত।

(২) লাগোস অঞ্চলে ফসলপ্রাপ্তির আশায় একটি কুমারীকন্যাকে, ভেড়া ছাগল ভুট্টা কলা ক্ষেম বা মেটেআলুর সঙ্গে পর পর শূলবিদ্ধ করে রাখা হত।[৭০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আফ্রিকার কোদালকাটা করে নারী-পুরুষ বলি দেওয়ার মতন ঝাড়গ্রাম সাবিত্রী মন্দিরে এককালে কোদালকাটা করে মাটির 'মাল' বলি দেওয়ার জনশ্রুতি আছে।

দেবতার বিবর্তন

বিভিন্ন দেশের বিচিত্র সমস্ত কাহিনী এবং অনুষ্ঠান আলোচনা করে দেখা গেল, প্রাচীন পৃথিবীর বিশাল অঞ্চল জুড়ে, ভিন্নতর নানাবিধ সমাজব্যবস্থায় বিচিত্রতর পদ্ধতিতে কুমারীবলি হয়েছে। কখনো এদের হত্যা করা হয়েছে আরাধ্যদেবীর মানবীরূপে কল্পনা করে, কখনো সন্তান-কামনায়, কখনো ধরিত্রীকে ঋতুমতী করে শস্যের ফলনবৃদ্ধি সংস্কারে, কখনো নদী বা জলদেবতার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য, কখনো মহামারির হাত থেকে গোষ্ঠীকে রক্ষা করার আশায়, কখনো অপদেবতা প্রেতাত্মার তুষ্টিতে, কখনো বা যুদ্ধজয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে, আবার কখনো বৃক্ষ পশু অর্ধপশু-দেবতার পরিপোষণার্থ।

বলির পদ্ধতিও বৈচিত্র্যময়। লাঠি বা মুগুর পেটা করা, বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া, টেনে-হিঁচড়ে মারা, তীর অথবা শূল বিদ্ধ করা. বুকে ছুরি বসিয়ে অথবা গলা কেটে মারা, জীবন্ত কবর দেওয়া বা আগুনে ঝলসে পুড়িয়ে মারা—এর কোনোটিই বাদ নেই।

মানুষ যখন আদিম জীবনযাত্রাকে অতিক্রম করে সভ্যতার দিকে ক্রমশ অগ্রসর

৭০. The Golden Bough, Ibid.Op cit.

হেচ্ছ, তখনও দেখা গেছে কুমারীকন্যা, গোষ্ঠী সমাজ অথবা ব্যক্তির এক বিশেষ আকাংক্ষা পূরণের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে। পাশ্চাত্যের বা আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতিবিদ্ গবেষকদের অনেকেই একে কখনো যাদু, কখনো বা কৃষিসংক্রান্ত প্রজনন চিন্তার ফসলরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

মূলে এই ধরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কোনোটিই যে কৃষিচিন্তার ফসল ছিল না তার ইঙ্গিত আগে দেবার চেষ্টা করেছি। তা-ই যদি হয় তবে পশু কিম্বা মানুষ বলি কেন? কেন বিশেষ করে কুমারীকন্যার হত্যা? এসব প্রশ্নের জট খুলতে হলে দেবচিন্তার ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

আজকের দেবকুল পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই মানবান্বিত হয়েছেন। অর্থাৎ, দেবতাদের আমরা মনুষ্যমূর্তিতে দেখতে বা কল্পনা করতে অভ্যাস্ত হয়েছি। অবশ্য গণেশাদি দু'একজন মাত্র দেবতা আজও অর্ধ-পশু অর্ধ-মানব স্তরে রয়ে গেছেন। মনুষ্য-মূর্তির আগের স্তরে প্রত্যেক দেশের দেবকুলই অর্ধ-মানব অর্ধ-মানবেতর প্রাণীতে মূর্ত হয়েছিলেন। ভারতের গণেশ, নৃসিংহ, নাগদেহে মনুষ্য মুণ্ডধারিণী মনসা, কোকামুখী দুর্গা, মধ্যপ্রাচ্যের বা গ্রীক-রোমীয় দেবদেবীর অথবা সুমেরীয়-আক্কাদীয় সভ্যতার গিলগমেশ, মেসোপোটেমিয়ার 'এনাকড়ু' অথবা মিশরের ওসিরিসপুত্র মনুষ্যদেহী শকুনমুণ্ড হোরাস, সিংহদেহ-মনুষ্যমুণ্ডী 'স্ফিংস', ব্যাঙমুখী মনুষ্যদেহযুক্তা দেবী হেক্ট্, ভেড়ামুখো মনুষ্যদেবী দেবতা খ্নুম্, মনুষ্যদেহে সিংহমুখী দেবী পাখ্ত্, বৃশ্চিকদেহে নারীমুণ্ডধারিণী দেবী সেল্ক্ বা সেলকেৎ, নারীদেহে অশ্বমুখী ফিগালিয়ার ডেমেটার, লগোসে বাজপাখির দেহে সিংহমুখী তম্মুজ—সমস্তই এর প্রমাণ। তাছাড়া, এই স্তরে বা তার পরবর্তীকালে দেব-দেবীরা ইচ্ছামত অথবা দেবতেতর নায়ক-নায়িকারা দেব-বরে ইচ্ছামত মনুষ্যমূর্তি ছেড়ে ছেড়ে মানবেতর প্রাণীতে (অথবা এর বিপরীত) রূপান্তর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের রূপকথায়, আমাদের দেশের ব্রতকথায় অথবা পুরাণ কাহিনীগুলিতে এর অজস্র উদাহরণ মিলবে। এরও পেছনের স্তরের দিকে তাকালে ভিন্নতর চিত্র দেখা যাবে।

"নিদ্দেস" নামে অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আমাদিগকে যে তথ্য প্রদান করে তাহার কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। ইহাতে একশ্রেণীর ভারতীয়দিগের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে 'হস্তী, ধেনু, সারমেয় বায়স [···] ইত্যাদির ভক্তের নিকট তত্তৎ বিভিন্ন সত্তাই পূজা ও ভক্তির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। [···]

হস্তী অশ্বাদিরূপে কল্পিত বিভিন্ন দেবতাই আদিম ভারতীয়দিগের অপরিশোধিত আধার ছিল।[৭১]

মিশর ব্যাবিলন বা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে, ক্রীট গ্রীস এবং রোম থেকে এই জাতীয় বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইংলণ্ডের সিংহ, ফরাসী জাতির ঈগল, রুশিয়ার ভল্লুক এবং এই রকম পৃথিবীর নানান দেশে নানাবিধ লোকসমাজে টোটেমরূপে পূজিত ভিন্ন ভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি সেই সমস্ত জাতির নিশান স্বরূপ (ইন্‌সিগ্‌নিয়া) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যেই কোনো না কোনো সময়ে এই প্রথা ছিল। আমাদের দেশেও এটার ব্যতিক্রম ঘটেনি।[৭২]

আমাদের দেশের গড়ুরধ্বজ, শিখিধ্বজ, ময়ূরকেতন, হনুমানের-ধ্বজা প্রভৃতি শব্দের এবং বস্তুর অনুষঙ্গ উপরিউক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে। এছাড়া বাংলার কুমারী-মেয়েরা যে সকল লৌকিক-ব্রত পালন করে তার মধ্যে একটির নাম 'কাকচিলের' ব্রত। এই ব্রতে মেয়েরা প্রাক্-বিবাহিত জীবনেই, একদিকে পিতৃকুল অন্যদিকে ভাবী শ্বশুর-গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে মৃত্যুর সময় জল পায়, তার জন্য মাটির কাক চিল শকুন কচ্ছপ কুমীর তৈরি করে সেগুলোকে ব্রতের জন্য কাটা পুকুরের জল খাওয়ানো অভিনয় করে বড় বড় দূর্বার সাহায্যে। শুধু তাই নয় আমাদের দেশের রূপকথায় বানর-রাজপুত্র প্যাঁচা-রাজপুত্রের মত আরও অনেক পশু পাখি রাজপুত্র আছে। 'ইউরোপীয় লোককাহিনীতে পশু-রাজকুমার একটা ভালুক নেকড়ে বাঁদর সাপ শূকর ব্যাঙ পাখি এমনকি গাছের রূপও নিতে পারেন।'[৭৩]

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সমস্ত কিছুই আমাদের মানবেতর প্রাণী-গোষ্ঠীর প্রতি মানুষের পূজা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক। অপরিশোধিত মানবেতর আদি প্রাণীদেবতা কেমন করে পরিশোধিত রূপ গ্রহণ করল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব প্রসঙ্গে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'নিদ্দেস' যে কথা বলেছেন, তার প্রমাণ আজও রয়েছে পক্ষিতীর্থের পাখিতে, বিকানীরের ইঁদুরের মন্দিরে জীবন্ত ইঁদুর দেবতায়

৭১. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পঞ্চোপাসনা। কলকাতা ১৯৬০। পৃ. ৮।

৭২. হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি: শৈবধর্ম (রুদ্র শিবোপাসনা)। পৃ: ১৫৬-৫৭।

৭৩. ডঃ হাইনশ মোডে: রাজা নাটকের লোককাব্যগত পটভূমি। নতুন থিয়েটার (থিয়েটার এ্যান্থোলজি), ২য় খণ্ড। কলকাতা ১৯৭৩। পৃ: ১০।

বারাণসীর রামসীতার মন্দিরে পূজাপ্রাপ্ত জীবন্ত হনুমান দেবতায়। এরা সকলেই ভক্তের সশ্রদ্ধ পূজা অর্ঘ্য পেয়ে থাকে।

বস্তুত দেবমূর্তি পরিকল্পনার ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে, প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় দেবতারা পশুপাখি এবং সরীসৃপ। সব দেশের পৌরোহিত্যই একটা বিশেষ স্তরে এসে এদের স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠেছে। (পাঠক যদি উপনিষদের উদ্ধৃত অংশের মন্ত্রসমূহ পড়ে দেখেন তবে এই উক্তির যথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন।) এরা দেবত্বের মহিমা পেল (কেন এমন হ'ল তা অন্যতর প্রবন্ধে[৭৪] বলেছি। এখানে শুধু বলছি—এর মূলে ছিল আদিম মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন। এর পরবর্তী স্তরে দেবতারা হলেন অর্ধ-পশু অর্ধমানব। দেবতাদের মানবায়ন হয়েছে সব শেষের স্তরে। এবং এই সঙ্গেই আদি দেবতা অর্থাৎ পশু পাখি-সরীসৃপসমূহ মানবায়িত দেবতার বাহন হয়ে গেল।

কি মানবেতর প্রাণী, কি অর্ধ-মানব পশু, কি পূর্ণ-মানবমূর্তি—সমস্ত স্তরেই দেবতারা অর্চিত। কিন্তু কেন মানুষের দেব-পরিকল্পনা? কেন তার ধর্মচিন্তা? প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জটিল। তথাপি এর সহজ এবং প্রাঞ্জল উত্তরটি বোধহয় এইরকম, 'কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চিন্তাভাবনা, সেই জনসমাজের প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। এক্ষেত্রে খাদ্যের যোগানই প্রধান'।[৭৫]

শুধু ব্যাপক অর্থে নয়, দেব-পরিকল্পনা প্রসঙ্গেও একথা প্রযোজ্য। পশু-পাখি-সরীসৃপ—আদিম মানুষের ধর্মীয় চিন্তায় যারাই পৌরোহিত্যের নিরলস সাধনায় দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছে, মূলে তারা ছিল সেইকালে বা তার বহু আগের যুগ থেকেই মানুষের খাদ্যের যোগান। অর্থাৎ শিকার এবং পশুপালন-মূলক অর্থনীতিতে এইসব দেবপরিকল্পনার উদ্ভব। আর প্রত্যেক প্রাণীর প্রজনন ঋতুই তাদের পূজাকাল-রূপে চিহ্নিত। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, প্রজননকাল যদি পূজার মাস বা ঋতুরূপে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে তার সঙ্গে হত্যা, প্রজনন-

৭৪ দীনেন্দ্রকুমার সরকার : বাঙালীর বারোমাসে ব্রতোপাসনা ও ষষ্ঠীব্রত। লোক লৌকিক, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা। কলকাতা ১৩৮৪।

৭৫. Donald A Mackenzie : Myths of Babylonia and Assyria, London.

The religious attitude of a particular community [ ] must have been dependent on its need and experiences, the food supply was the first consideration (P. 42).

শোণিত, কণ্ঠ-কবন্ধ-রুধির, মৈথুন এবং উপাসনা-আরাধনা মিলেমিশে একাকার হয়ে সমস্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপারগুলিতে জট পাকিয়ে গেল কি করে ?

যে কুমারীকন্যাকে বলি দেওয়া হত, সে-ই কিন্তু দেবীরূপে পূজিত। (রেড ইণ্ডিয়ান পূজাতেও তাই)। যামালতন্ত্র বিভিন্ন বয়সের পূজ্যা কুমারীকন্যার ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করেছে। এক থেকে ষোল বৎসর পর্যন্ত কুমারীর নাম যথাক্রমে: সন্ধ্যা সরস্বতী ত্রিধামূর্তি কালিকা সুভগা উমা মালিনী কুব্জিকা কালসন্দর্ভা অপরাজিতা রুদ্রাণী ভৈরবী মহালক্ষ্মী পীঠনায়িকা ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অম্বিকা। এই নামকরণের পর যামালতন্ত্রে বলেছে, 'কন্যা যাবৎকাল ঋতুমতী না হয় তাবৎকাল তাহাদিগকে পূজা করিবে। তন্মধ্যে পূর্ণিমাতে পঞ্চদশী অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞার এবং অমাবস্যায় ষোড়শী অম্বিকার পূজা করিবে।'[৭৬]

যৌবনাগমের পূর্ব পর্যন্ত পূজা চলবে। একথা যামালতন্ত্রের। পূজার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে দেখা যায়, দেবী বলছেন: 'নাথ, আমিও কুমার, তুমিও কুমারী—অর্থাৎ সমস্ত কুমারীই তোমার আমার অংশ। [...] কুমারীই সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পরমদেবতা।'[৭৭] কিন্তু প্রশ্ন, তান্ত্রিক সাধকরা পরম দেবতা-জ্ঞানে এই কুমারীকন্যাকে পূজা করছেন কেন? কেনই বা রেড ইণ্ডিয়ান পুরোহিতরাও একই ধর্মীয় আচরণে নিযুক্ত থাকেন?

> কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক সকলেরই হিন্দুর সাধনতত্ত্ব বুঝিতে হইলে কাম ও মদন এই দুইটির মূল অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। [...] এক আমি বহু হইব এই কামনা হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি। 'সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্'— ইহাই শ্রুতিবাক্য। এই কামনা বা ইচ্ছা তাঁহাতে বর্তমান। [...] যে শক্তির সাহায্যে মানুষ এক হইতে বহু হইতে পারে, তাহাই দেহজাত আদিরস। [...] জীবদেহ হইতে যাহা (আদিরস) নির্গত হয়, তাহা হইতেই জীবের সৃষ্টি হয় [...]। ইহাই সৃষ্টি প্রহেলিকা; এ প্রহেলিকা বুঝিবার নামই সাধনা, আরাধনা, উপাসনা। তন্ত্র এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তন্ত্র বলেন যে—

৭৬. কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বিরচিত ও পঞ্চানন তর্করত্নভট্টাচার্য সম্পাদিত, তন্ত্রসার কলকাতা ১৩৩৪, পৃ ৯৭২।

৭৭. প্রাগুক্ত।

যে রসের প্রভাবে রূপের বিকাশ, মোক্ষের বিকাশ, শেষে এক হইতে বহুর বিস্তৃতি,

সেই রসই আদিরস, সেই রসের সাহায্যে যে সাধনা তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।[৭৮]

ভারতীয় চিন্তায় 'শ্রুতিশাস্ত্র' থেকে তন্ত্রসাধনা পর্যন্ত সবত্রই পূজা বা আরাধনা হচ্ছে আদিরসের সাধনা। শ্রুতিবাক্যেও যে আদিরসের সাধনা স্বীকৃত তার প্রমাণ মিলবে বৈদিক হোমে, বিভিন্ন ঋকসূক্তে। বৈদিক চিন্তার পরিশীলিত রূপে নিরাকার, নিরুপাধি, নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা হলেও, সে ক্ষেত্রে সাধনা শান্তরসের হলেও স-গুণ ব্রহ্মকে সৃষ্টির উৎস হিসাবে গ্রহণ করাকে শ্রুতিশাস্ত্র অস্বীকার করেনি। স-গুণ ব্রহ্মের উপাসনা আদিরসের পথেই হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন 'পূজা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ভেনেরেসন'-এর অর্থও হুবহু একই।[৭৯] ভারতীয় ভাষায়, বিশেষ করে বৈদিক-পরবর্তী সংস্কৃত এবং বাংলায় 'পূজা' শব্দের যে অর্থানুষঙ্গ আছে তাতে পূজার অর্থ 'অর্চনা'। অথচ এই শব্দটিই অর্থের ক্ষেত্রে এত বেশি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যে আজ আর প্রাথমিক অর্থে তাকে চিনবার উপায় নেই। তবু, স্যার মনিয়র উইলিয়মস্-এর অভিধান, যাস্কের নিরুক্ত এবং বিভিন্ন শব্দালোচনা প্রসঙ্গে বুৎপত্তি নিয়ে দুর্গাচার্যের সঙ্গে বিভিন্ন মতবিরোধ অভিনিবেশ সহকারে দেখলে দেখা যাবে যে শব্দটি তার আদিম ব্যবহারে ইংরেজী শব্দটির মত একই অর্থানুষঙ্গে প্রযুক্ত হত।

এক কথায় বলা যায়, তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির পেছনে যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, তারই সঙ্গে 'পূজা' শব্দের প্রাথমিক অর্থ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে কুমারী পূজা তন্ত্রসাধনার অঙ্গ সে সম্বন্ধে মত লক্ষ্য ছিল—পূজা করার উপায় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। কারণ আদিম মানুষ মিলনের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে অবহিত

৭৮ পঞ্চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড (রস ও রমন)। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, কলকাতা ১৩৬০, পৃ ২৪-২৫।

৭৯ Sex and Sex Worship, pp 468-469

Among the Greeks and Romans Aphrodite or Venus, being the goddess of physical and promiscus love, was represented naked, [ ]

In her temple men and women worshipped by indulging in coition in her honor The genetive of her name is venerics, and by changing the last syllable to the infinitive ending, the verb venerere was obtained, and from this in turn the word veneratio or veneration, which originally meant the form of worship just mentioned, but which with us now means merely an act of veneration or worship

ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, ব্যাপকতর অর্থে প্রকৃতির জঠরই সৃষ্টিকর্তা পুরুষের ভূমিকা সেখানে কেবলমাত্র সৃজনভূমির দ্বার উন্মুক্ত করা।[৮০] 'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে যাস্ক যে ব্যাখা দিয়েছেন তাও এই অর্থই বহন করে। আজও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় এর প্রমাণ পাই। এখনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে বলি ভগবানের দয়া। এই দয়া ভিক্ষার জন্য সন্তান কামিনী দেবতার কাছে মানত করে, হত্যা দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে পুরুষের সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না, তা না জেনে, ক্ষেত্র বিশেষে জেনেও ডাক্তারের পরিবর্তে নাসিকের 'কোলি'-নায়িকার মত কাণ্ড করে বসে। এ ছাড়া, অলৌকিক উপায়ে সন্তান লাভের কাহিনী বুদ্ধ অথবা যীশুখৃষ্টের জন্ম কাহিনীতে অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতের বীরাচারী ভৈরবরা যে 'গৌরীগড়ন' অনুষ্ঠান করে তাও এই অবৈজ্ঞানিক ধারণাপ্রসূত। প্রকৃত প্রস্তাবে, তন্ত্রের সাধন পদ্ধতি মানব-মানবীর দেহগত আদিরসের সাহায্যে সাধনা। কৌমার্য এই আদিরসের উদ্বোধন কাল এবং এ কারণেই এর গুরুত্ব এত বেশী। আর এই সাধনার নামই পূজা বা আরাধনা। কুমারী পূজার মূল উদ্দেশ্য তাই সৃষ্টি শক্তি উদ্বোধনের প্রতি ভক্তি নম্রচিত্তে মানুষের শ্রদ্ধানিবেদন।

বহুধা হবার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল, যতদূর সম্ভব দ্রুত বংশ তথা গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে হিংস্রপ্রাণীসমাকীর্ণ পৃথিবীতে টিকে থাকবার। আদিম মানুষ তাই বিশেষ তাগিদ অনুভব করেছিল বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানবগোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য। এবং এই আকাঙ্ক্ষার সাধনোচিত পন্থাই তন্ত্রসাধনার দেহনিঃসৃত-রসের সাধনা। কুমারী তথা দেবীকে যে চন্দন-পুষ্পে চর্চিত এবং অর্চিত করা হয় তা-ও তার দেহেরই আদিরস।

> হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও রক্তপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে (এঁরই মানবীরূপ কুমারীকন্যা) নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।[৮১]

৮০. S. D. F. M. & Lengend, p. 661.
It is belived for example that the man's role in coition is supply to "open the way"...

৮১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: লোকায়ত দর্শন। কলকাতা ১৯৬৩। পৃঃ ৪:৬।

এই দেহরস যে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় একের বহুধা হবার পথে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত, আদিম মানুষ বহুদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটা বুঝেছিল। এবং বুঝেছিলে বলেই এর মূল্য তার কাছে ছিল অপরিসীম। কিন্তু যেহেতু বর্তমানকালের অধিকাংশ মানুষের মতন সেই যুগের মানুষের কাছেও এর বৈজ্ঞানিক দিকগুলো অজানা ছিল, তাই তার ধারণা হয়েছিল এগুলো পান করলেও প্রজনন হতে পারে। (কারণ হিসাবে বলা যায় পশ্বাচারকেই কথনো তান্ত্রিক কথনো বা বৈদিক আচাররূপেই গ্রহণ করা হয়েছে অজ্ঞানতাবশতঃ। 'বেদোক্তেন যজেদ্ দেবাং কামসংকল্পপূর্বকম্। স এব বৈদিকাচার পশ্বাচাব স উচ্যতে'। এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধনপন্থায় এই দেহরস-পান অন্তর্ভুক্ত করল।

> যেমন 'ঠাঙ্গরিয়া মহাপুরুষিয়া মত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে—অপব আরিতিরা নামে এক মত (।) তাহা গোপনীয়রূপে সম্পন্ন হয়(।) [···] তাহার স্থুল ধর্ম এই (—' ব্রাহ্মণ সেবা না করিয়া ভক্তসেবা একটা করে (।) তাহা রাত্রে হইয়া থাকে (।) সংগোপনস্থানে অমেধ্য অপেয় মদিরাদি একত্র পাক করিয়া সর্বজাতি একত্র উপবিষ্ট হইয়া পানভোজন করে (।) অন্ন পরিবেশন কর্ত্রী এক স্ত্রীলোক থাকে (।) তাহাকে থালপহারি কহে (।) এবং একজন রযো [রজো] বিশিষ্টা যুবতী থাকে (।) তাহাকে ভক্তিমাতৃ কহে (।) শূন্যাগারে মুক্তকেশী দিগম্বরী হইয়া উপবিষ্ট হইলে তৎস্তনমণ্ডলে দুগ্ধ দেয় (।) যোনিমণ্ডলে পাতিত হইলে অঙ্গোদক জ্ঞানে সকলেই পান করে।[৮৩]

দুগ্ধমিশ্রিত সৃষ্টিশোণিত পানের এই বিধি আদিম চিন্তাধারাপ্রসূত হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে দেহরসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গুরুত্ব আরোপ। আমাদের আধুনিক পরিশীলিত চিন্তার কাছে,মননশীলতার কাছে এগুলি যতই আদিম রুচিবিগর্হিত ঘৃণাকারজনক বলে মনে হোক না কেন, অস্বীকার করার উপায় নেই যে সাধনপদ্ধতি অথবা কুমারী পূজার এগুলি অঙ্গ ছিল। এই সহজ সত্যকে মেনে নিয়ে এবং এক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি দিয়ে এগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে অনেক অনুদ্ঘাটিত রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হবে। অশ্লীল

৮২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ। 'পশ্বাচার' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৮৩. হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বিরচিত এবং শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম.এ. তত্ত্বরত্নাকর সম্পাদিত : আসাম বুরুঞ্জি। গৌহাটি ১৩৬৯ বাং। পৃঃ ৯৯। (পড়ার সুবিধার জন্য বন্ধনীস্থ চিহ্নগুলি বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রদত্ত।)

রুচিবিগর্হিত আদিম বর্ব্বর বলে নাসিকাকুঞ্চিত করলে অথবা ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবহেলা প্রদর্শন করলে, মানবচিন্তার ক্রমবিকাশের সঠিক ধারাটিকে আমরা খুঁজে পাবো না। এবং যখনই প্রাসঙ্গিক আলোচনার মুখোমুখী হব অথবা দেশের কিম্বা বিদেশের পুরাকাহিনী পড়তে পড়তে এই ধরণের অনুষ্ঠান দেখতে পাবো, তখন অন্ধকার হাতড়ে গোঁজামিল দিয়ে যা হোক একটা ব্যাখ্যা খাড়া করবার অপচেষ্টায় আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠব। বর্তমান এবং অতীতের অনেক সংস্কার বা অনুষ্ঠানের অর্থ আমরা খুঁজে পাবো না। সবচেয়ে বড় কথা সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় মধ্য দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষেরা বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের আমাদের জন্য সুন্দরের আরাধনার ইঙ্গিত রেখে গেছেন তাকে সনাক্ত করতে পারবো না। সেই সুন্দরের লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের ভুল হয়ে যাবে।

আজ গতানুগতিকভাবে করে গেলেও আমরা কখনো চিন্তা করি না যে একালেও অনেক জায়গায় নববিবাহিতা তরুণী প্রথম পতিগৃহে প্রবেশ করলে তাকে পাথরের থালায় রক্ষিত দুগ্ধমিশ্রিত (অলক্ত, আলতা-জলে যে ভাবে দাঁড় করানো হয়, সেটাও এই একই চিন্তার প্রতীকিত রূপমাত্র (অলক্ত < অরক্ত < আরক্ত)। যে চরণামৃত আমরা পান করি তাও দেবতামূর্তিকে স্নান করানো অঙ্গোদকই। তাই বলে এরা আজ আদিম নেই; এরা সুন্দর, এরা মনকে বিনম্র করে। অর্থাৎ সাধন পন্থার বিভিন্ন উপাদান ধীরে ধীরে মানুষের সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে মিলে মিশে প্রতীকিত হয়ে উঠেছে। তার মানসিকতাকে উন্নীত করেছে। এবং এটাই হচ্ছে মানুষের অগ্রগতির লক্ষণ, তার মানসিকতার পরিশীলনের পথরেখা। এইখানেই মানুষ উন্নত, সে প্রণাম্য, শ্রদ্ধার্হ। সভ্যতার অগ্রগতি তাই আমাদের উন্নততর জীবনের পথপ্রদর্শক।

অন্যদিকে, নারীর দেহরসের সঙ্গে সমান গুরুত্ব পেয়েছে পুরুষের দেহরসও। বীজমার্গীরা শুক্রকেই পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। কেননা শুক্র হইতেই সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয়। [...] শুক্র উপনিষদে আত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে বোধিচিত্ত বা স্বয়ং 'বুদ্ধ' বা পরমসত্তা-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, বাউলরা ইহাকে বীজরূপী পরমাত্মা বলিয়াছে [...]।[৮৪]

৮৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: বাংলার বাউল ও বাউল গান। কলকাতা ১৩৬৪। পৃঃ ৪২৮-২৯।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দৃষ্টিতেও এই শুক্র বা দেহরস অত্যন্ত পবিত্র।

"এই বিষয়টি (বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান রূপ অধোপহাস) জানিয়াই উদ্দালক আরুণি বলিয়াছিলেন, ইহা জানিয়াই মুদ্গলপুত্র নাক বলিয়াছিলেন, ইহা জানিয়াই কুমার হারিত বলিয়াছিলেন, 'এইরূপ অনেক নামমাত্র ব্রাহ্মণ আছে যাহারা এই তত্ত্ব না জানিয়া রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ফলে বিকলেন্দ্রিয় ও পুণ্যহীন হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে।' জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় ইহাদের প্রভূত পরিমাণ শুক্র স্খলন হয়। ৬. ৪. ৪.।

নির্গত শুক্র স্পর্শ করিয়া সে তখন জপ করিবে—'আজ আমার যে শুক্র পৃথিবীতে স্খলিত হইল, অথবা যে শুক্র ঔষধি ও জলে নির্গত হইয়াছে তাহা আমি গ্রহণ করিতেছি'। এই মন্ত্র পাঠের পর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সে শুক্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় বলিবে—'নির্গত শুক্ররূপ ইন্দ্রিয় পুনরায় আমাতে ফিরিয়া আসুক এবং দেহকান্তি, সৌভাগ্য ও তেজ আমাতে প্রত্যাবর্তন করুক'। অগ্নিতে আশ্রিত দেবগণ পুনরায় এই শুক্রকে যথাস্থানে স্থাপন করুন'। এই মন্ত্রোচ্চারণের পর সেই শুক্র স্তনদ্বয় বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ঘসিয়া দিবে। ৬. ৪. ৫।[৮৫]

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সে যুগের মানুষ সৃষ্টিবিষয়ক অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেও এটা তাদের জানা ছিল না যে একবার নির্গত দেহরস জল অথবা বাতাসের সংস্পর্শে এলে তার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কেবলমাত্র ঔপনিষদিক মন্ত্রে নয়, একই অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ প্রত্যক্ষ করা যায় লৌকিক ধর্মীয়-আনুষ্ঠানিক চিন্তাতেও।

নদী ও বসুমতীপূজার প্রাথমিক রূপটা আজও আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। মৃত্তিকার একটি তাল তৈরী করে তার গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ এবং সেই নিষিক্ত মৃৎপিণ্ড মাটিতে পুঁতে তার উপর হল-চালনা উত্তরবঙ্গের উপান্তসীমায় আজও হাজংদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের নাম 'গেরবাহান' (গর্ভাধান?) [...]। প্রথম ঋতুমতী বালিকার শোণিতসিক্ত ন্যাকড়া শুক্র-নিষিক্ত করে একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপযোগে সেই রজোবীর্যমণ্ডিত আলোকশিখা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে সিংভূম ও মানভূম অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে। তাঁরা একে বলেন 'সাম্পন' (সম্পাদন?)।[৮৬]

এখানেই শেষ নয়। বীজমার্গী বাউল 'ঠাঙ্গরিয়া মহাপুরুষিয়া' মতাবলম্বীদের মধ্যে নারীর দেহরস পানের মত সাধন-পদ্ধতিতে পুরুষের দেহরস পানের রীতিও প্রচলিত।

৮৫. বৃহদারণ্যক উপনিষদ। হরফ প্রকাশনী। কলকাতা ১৯৭৬। পৃঃ ৪৯৭-৯৮।

৮৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত: সমাজসমীক্ষা—অপরাধ ও অনাচার। কলকাতা ১৩৬৮। পৃঃ ৬।

'শৈবশাক্তাদির ন্যায় ইহাদেরও একরূপ চক্র হয় ও তাহাতে অতীব গুহ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে ঐ চক্রের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কোন বীজমার্গী নিজ বাটির স্ত্রীলোকবিশেষকে কোন সাধুর অর্থাৎ উদাসীন বিশেষের সহিত সহবাস করাইয়া তাহা হইতে শুক্র নির্গত করাইয়া লয়। এই বীজ এক শিশিতে পুরিয়া রাখে ও চক্রের দিবস ঐ শুক্র সমাজগৃহে আনয়নপূর্বক একটি বেদীর উপর পুষ্পশয্যার মধ্যস্থানে একটি পাত্রে স্থাপন করে। এবং তাহাতে দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, দধি মিশ্রিত করিয়া পঞ্চামৃত প্রস্তুত করে। সেই পঞ্চামৃত ঐ পাত্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প ও মিষ্টান্ন দিয়া ভোগ দিয়া সমাজস্থ সকলকে পরিবেশন করিয়া দেয়। ইহারা চক্রস্থলে কোন জাতিবিচার করে না। সকলের অন্ন সকলেই ভক্ষণ করে।'[৮৭]

কাজেই, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির যে বিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা বিবৃত করেছি তা থেকে অতি যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কুমারীপূজার রজঃপান, বীজমার্গীদের শুক্রপান অথবা বৈদান্তিক চিন্তার শুক্র-পুনঃ-সংস্থাপন এবং আদিবাসীদের নদী ও বসুমতীপূজার আনুষ্ঠানিক রীতি-পরিকল্পনা— ইত্যাকার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের পেছনেই রয়েছে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে সৃষ্টির রহস্যকে জানা। এক থেকে বহু হওয়ার রহস্যকে উদ্ঘাটন করা।

আবার, এই দেহরসের সাধনার জন্য নারীকে যথাশীঘ্র সম্ভব তৈরী করে নেওয়ারও এক অদ্ভুত রীতি প্রচলিত আছে। শৈবদের মধ্যে যে গৌরীগরণ (গ্রহণ? করণ?) অনুষ্ঠানটি প্রচলিত, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

এই অনুষ্ঠানটি প্রকৃতপক্ষে অঋতুমতী বালিকাদের কৌমার্যহরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। দশমহাবিদ্যার প্রতীকরূপে দশটি অজাত-ঋতু বালিকাকে স্নান করিয়ে, বিমুক্ত বেশে বিস্রস্ত কেশে মৃত্তিকা নির্মিত ছোট ছোট বেদীতে বসানো হয় এবং ফুল, বিল্বপত্র ও আতপ চাউল সহযোগে তাদের যোনিদেশে গৌরীপীঠের প্রতিষ্ঠা করে শিবরূপী এক ভৈরব তাদের কৌমার্য হরণ করেন। এই ভৈরবের উচ্ছ্রিত অঙ্গকে দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করা হয়, তারপর নির্মল চিত্তে শিবমহিমায় সমাবিষ্ট হয়ে প্রত্যেকটি মহাবিদ্যার গৌরীপীঠে শিবপ্রতীক নিয়োগ করেন। [...]একজন ভৈরবের পক্ষে এতগুলি গৌরীর কৌমার্যভেদ সম্ভব নয় বলে, তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। [...] একদিকে বালিকাদের আর্তনাদ অন্যদিকে শিবানুচরদের সংকীর্তন শুরু হয়। আর তারি ভেতর গৌরীগরণ অনুষ্ঠিত হতে

৮৭. বাংলার বাউল ও বাউল গান। ঐ। পৃঃ ৪২৮।

থাকে। এই অনুষ্ঠানের শোণিত-নিষিক্ত ন্যাকড়া 'সিদ্ধ বস্ত্ররূপে' সমাজে চলে। রোগ-বিনাশ, শত্রুনিপাত, মামলা জয়; পরীক্ষা পাশ ইত্যাদির ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রদ বলে বিশ্বাসে অনেকে তা সংগ্রহ করে রাখেন।'

উত্তররাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে এ অনুষ্ঠান চলিত আছে [·] এইভাবে একশো আটটি কুমারীভেদ করতে পারেন যে ভৈরব তিনি নাকি পুরোপুরি শিবের পদবী লাভ করেন।[৮৮]

কৌমারভেদ বা কৌমারহত্যার এই অনুষ্ঠানের পেছনেও মনে হয় সেই একই অজ্ঞতাপ্রসূত। ধারণা যেখানে মানুষ মনে করে সৃষ্টির ব্যাপারে পুরুষের ভূমিকা সৃষ্টি-গৃহের দ্বার উদঘাটন করা মাত্র। ভৈরব এই অনুষ্ঠানে কেবল সেই কাজই করেন। মনে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিম-সেরামের পুরাণকাহিনীর হেইনুউয়েলের দেহরস (মূত্র) পার্থিব সম্পদ দেয়, অন্যদিকে আমাদের দেশের গৌরীগণের অনুষ্ঠানে দশমহাবিদ্যার আনুষ্ঠানিক দেহরসও অকল্যাণ হরণ করে। একই চিন্তা হেইনুউয়েলি নিহত হয়ে দেবীর অর্ঘ্য হয়, নাচের আসরের উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এদেশের কুমারীর কৌমার নিহত হলে সে গৌরী বা দেবীপদবাচ্য হয়।

কিন্তু প্রশ্ন থাকে, এই দেহরস তো পূর্ণবয়স্ক যে কোনো মানুষের মধ্যেই রয়েছে তবু পূজায় কুমারীকন্যার এত গুরুত্ব কেন? এই প্রসঙ্গে দুটি-মাত্র কথাই বলা যায়—প্রথম কৈশোর দেহে এবং মনে সৃষ্টির যে মহৎ উন্মাদনা আনে (যার সুন্দর অভিব্যক্তি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়, অথবা পৌরাণিক কাহিনীর নায়িকা কিশোরী উমার মধ্যে যে অনির্বচনীয় রূপ ফুটে উঠেছে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যে পতিপ্রাপ্তির তপস্যায় 'অপর্ণা'-রূপে, মদনভস্মে), কৈশোর হৃদয়বৃত্তিতে যে অপরিসীম ঔদার্য ও মহত্ত্ব আনে (গৌরাঙ্গসহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিবিরহবিধুর দিনযাপনের অথবা কুন্তীর মাতৃহৃদয়ের হাহাকারকে হৃদয়ে পাষাণভাবে চেপে রেখে অবোধ শিশু কর্ণের পরিত্যাগের চিত্র)—জীবনের পরবর্তী কোনো স্তরেই এমনটি আর লক্ষ্য করা যায় না। কৌমার্য তথা কৈশোর-ই মহৎ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করতে পারে। আর কুমারীকন্যা নিজের কুমারীত্বকে হত্যা করেই সেই মহৎ সৃষ্টিকে ধারণ করে। প্রথম সৃষ্টির উন্মাদনায় যে অনাবিল আনন্দ বয়ে যায়, সেই আনন্দ এবং মহত্ত্ব, সেই বীরত্ব এবং ঔদার্য, সেই সার্বজনীন প্রীতির ভাবই প্রথম সন্তানের মধ্য দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করে। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ

---

৮৮. সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার। ঐ। পৃঃ ৩৮।

জীবন-যোদ্ধা কর্ণ (অর্জুন নন) তাই কানীন-পুত্র, যীশুখ্রীষ্ট তাই কুমারী-মাতার সন্তান। যোয়ান অব আর্কের মৃত্যুপণ দেশপ্রেম এই কৌমার্যের-ই মহৎ অবদান। কুমীরত্ব তাই নমস্য, শ্রদ্ধার্হ। তন্ত্র-সাধনায় এইজন্যই কুমারীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় পূজা।

কিন্তু এই মহীয়সী কুমারীকে, নিজে দেবীর আসনে বসেও, ছিন্নমুণ্ড হ'তে হয়। এর কারণ কি? এর স্বরূপ বা কারণ জানতে এবং বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে আদিম অর্থনৈতিক জীবনে, আদিম দেব-পরিকল্পনার পটভূমিতে।

আগেই দেখা গেছে, মানবেতর প্রাণীরাই হল প্রথম স্তরের দেবতা। এরা ছিল শিকার এবং পশুপালন অর্থনীতিতে মানুষের খাদ্যের মূল যোগান। তাই এদের প্রজনন ঋতুগুলো সেই সেই দেবতার পূজাকাল রূপে চিহ্নিত হয়েছে। মানুষ তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছিল, উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে দেবতারূপী-প্রাণীসমেত প্রায় সমস্ত মেরুদণ্ডী জীবেরই মিলন হয় মূলত ঋতুরজঃ অথবা সেই সময়ের দেহগন্ধের আকর্ষণে। যখন কৃত্রিম গন্ধ ব্যবহার করতে শেখেনি তখন আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল মিলনের সংকেত। এর প্রমাণ মিলবে মহাভারতের ব্যাসদেব-মাতা মৎস্যগন্ধার কাহিনীতে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র পূর্বোদ্ধৃত অংশবিশেষে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আদিম মানুষ তার শিকারজীবনে জেনেছিল, মিলনের এই বিহ্বল মুহূর্তে সব পশু-পাখিকে শিকার এবং হত্যা করা সহজ। পশুপালন মূলক অর্থনীতির স্তরে তাই অধিকতর খাদ্যবস্ত্র আচ্ছাদন এবং আসবাবপত্র পাওয়ার সংকেত ছিল এই দেহরস এবং তার গন্ধ। স্বভাবতই সৃষ্টি-শোণিত-মিলন-হত্যা সবই ছিল এই অর্থনীতিতে খাদ্যপ্রাপ্তি এবং জীবনধারণের বিভিন্ন দিক। শুধু খাদ্যের তাৎক্ষণিক প্রাপ্তিই নয়, এইসব প্রাণীর বংশবৃদ্ধির তথা মানুষের জীবনধারণোপায়ের বিভিন্ন দিকের সংকেতও এই দেহরস। কালক্রমে এই মিলন এবং সৃষ্টির অপরিজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সচেষ্ট হল মানুষ। এইসব পশুপাখি এবং তাদের দেহস্থিত প্রজননভূমি দেবত্বের মহিমা লাভ করল পৌরোহিত্যের সাধনায়।

পরবর্তীকালের হস্তাবলেপনে ভিন্ন ভিন্ন দেশে. তাদের নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশ, নিজস্ব পারিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একই চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য দেখা দিল। পূজা এবং হত্যা, সাধন এবং দেহরস, পূজা এবং শিকার, আরাধনা এবং মৈথুন—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

যে পশু আদিম মানুষের খাদ্যের মূল যোগান—সে-ই তার দেবতা। তাই

দেবতার আসনে বসেও পশুকে হত হতে হয় । অশ্বমেধের অশ্ব স্মরণীয়)। মনে রাখা প্রয়োজন মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু কুকুরজাতীয় প্রাণী। এবং এই নির্দিষ্ট প্রাণীটিই দেববাদের উন্মেষের প্রথম যুগ থেকে প্রায় সব দেশে দেবতা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে (ভারতবর্ষও এই চিন্তার বাইরে ছিল না। অশ্বমেধের যজ্ঞীয় অশ্বকে দিগ্‌বিজয়ে পাঠাবার আগে যে পবিত্র জলে স্নান করানো হত সেই জলে রাখা থাকতো একটি চারচক্ষুবিশিষ্ট নিহত কুকুর)।[৮] এই প্রাণীটিকে বশীভূত করতে হলে এবং তার থেকে প্রয়োজনীয় কাজ আদায় করতে হলে তাকে নানাবিধ পশুমাংস এমনি কুকুরের মাংসও খাদ্য হিসাবে দিতে হয়। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আদিম মানুষ ভেবেছিল যে পশুদেবতার কাছে পশুহত্যা করে তার রক্ত-মাংস নিবেদন করলে দেবতা সন্তুষ্ট হবেন, এবং সে নিজে আরও বেশি খাদ্য তথা সমৃদ্ধির অধিকারী হবে। কাঁচা অথবা ঝলসানো মাংস খেতে সে নিজে অভ্যস্ত আদিম জীবনযাত্রা থেকেই। নিজে যাতে সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত তাই সে উৎসর্গ করতে লাগল পশুদেবতার কাছে। এমন যুক্তি অনেকেই দেবেন।

কিন্তু এ ধরণের বক্তব্য ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না এই কারণে যে, যতগুলি উদাহরণ আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তার কোনোটিতেই রক্তের সঙ্গে মাংসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়নি পূজায়। সর্বত্রই রুধির, মূলত কণ্ঠ-রুধির। হেইমুউয়েলির কাহিনীতে ডেমা-গোষ্ঠীর দেবী সাতেনকে কুমারীর হাত উৎসর্গের কথা আছে। কিন্তু হাত যে প্রজনন-চিন্তার সঙ্গেও যুক্ত একথা আমরা আগেই বলবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া মানুষ দেব-পূজা করে সৃষ্টির জন্য, মঙ্গলের জন্য ; সৃষ্টিরহস্যকে জানবার জন্য। সেই পূজা ধ্বংসের জন্য নয়। অন্য অর্থে, সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলবার জন্যই দেবোপাসনা, তার আরাধনা। পশু অথবা পরবর্তীকালে মানবরূপী দেবতার সৃষ্টি-আকর্ষণ বিশেষ বিশেষ ঋতুপর্যায়ে ঋতুরক্তে—কবন্ধ রুধিরে নয় (মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টির উৎস নিহিত দেবতার শক্তিতে)। কিন্তু

৮. A. B. keith: The Veda of the Black Yajus School Entitled . Taittiriya Samhita. Delhi 1967. Vol I p. CXXXIV.

[...] the decoration of the horse and the driving of it into water the water being an essential part of the sacrificial ground. Moreover, the bathing of the horse before its wandering, a 'four-eyed' dog is slain and allowed to float under it in the water.

পৌরোহিত্যের নতুন নতুন নির্ধারিত নিয়মকানুনে মানুষ ভুলে গেল এই সহজ সত্যকে। এমনকি রাজবল্লভীর অর্ঘ্য এখন যেখানে পশুকণ্ঠনিঃসৃত রুধির, সেখানেও তার উৎসমুখে যে তা ছিল না —সেটা বোঝা যায় 'উৎসর্গপাত্র' খর্পরের আকৃতি এবং চিহ্ন-বিচার করলে।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা বলা যাক। বিষ্ণুপুরে যে ছিন্নমস্তার মন্দির আছে তার এক পুরোহিতকে একসময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, মায়ের এ মূর্তি কেন? ভদ্রলোক বলেছিলেন—এটাই হচ্ছে মায়ের সৃষ্টিমূর্তি; পদতলের মিথুনযুগলের দিকে লক্ষ্য করুন। (ঠিক কথাগুলি উদ্ধৃত করতে না পারলেও তাঁর বক্তব্য এটাই ছিল)। অন্য এক প্রসঙ্গে এক ভক্তজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম একই কথা। তিনি বললেন, একজন সাধকের কাছে তিনি শুনেছেন যে মূর্তিটি রূপক। আসলে মায়ের নিজের সৃষ্টিরুধির নিজেই পান করেন। অর্থাৎ সৃষ্টি-রুধিরে যে সৃষ্টিবীজ লুক্কায়িত থাকে তাকে নিজেই ধারণ করেন। ব্যাখাটি আমার ভালো লেগেছিল। আমরাও বলতে চাই ছিন্নমস্তা বা কুমারীর কণ্ঠচ্ছেদ—এটা রূপক।

কাজেই, উৎসে যেটা ছিল শিকার (অর্থাৎ মিলন) ঋতুর সংকেত, সেটাই ফলশ্রুতিতে পশুহত্যা বা পশুপালন অর্থাৎ শিকারবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কান্বিত হল। অথচ মানুষ যখন এই উৎসকে ভুলে গেল, তখন পূজায় সেই হত্যা ভুল ব্যাখায় স্থান পেয়ে বলিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

পশুগমন

'হত্যা' অর্থে মূলে কি বোঝাতো তা আলোচনার আগে দার্শনিকতা বিহীন আরো একটি আদিম রীতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যাক। উল্লিখিত সংকেত অবলম্বনে পশুদের এবং মানবেতর অনেক প্রাণীরই মিলন, ফলশ্রুতিতে নবতর সৃষ্টি—শিকার এবং পশুপালনের-স্তরের জনগোষ্ঠীর এটাই জীবন অভিজ্ঞতা। একারণেই, পশু যখন দেবতার স্তরে উন্নীত হল। তখন তার সঙ্গে মিলিত হয়ে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলে মানুষের বিবাহিত জীবন সুখের হবে, মানুষ উপযুক্ত এবং যথেষ্ট সংখ্যক বংশধর লাভে সক্ষম হবে—পৌরোহিত্যের এই নির্দেশই প্রাক্-বিবাহকালে পশুমৈথুনকে মানুষের কাছে একটি আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে পরিণত করেছিল। এই রীতির রাশি রাশি

উদাহরণ রয়েছে মিশরীয় এবং আসীরীয় সভ্যতায়,[১০] হারকুলেনীয়ম-পম্পিয়াইতে। বৃষ মেষ ছাগ—এরা সকলেই সর্বত্র দেবতা এবং এদের কৃপালাভ ও আশীর্বাদ লাভের জন্য পশুমৈথুন প্রচলিত। একই নির্দিষ্ট রীতি প্রচলিত ছিল আমাদের দেশেও। কয়েকটি উদাহরণ এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।

(১) অশ্বমেধের অশ্বের সঙ্গে প্রযুক্ত একটি শ্লোক এইরকম: 'অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নম্ তু পত্নীগ্রাহ্যম্ প্রকীর্তিতম্'।[১১] ডঃ ভট্টাচার্য এই শ্লোক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র বিবাহিতা নারী তথা রাজমহিষীর কথা বলেছেন। কিন্তু 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুযায়ী: 'পত্নীতুল্যা পাণিগ্রহণাদি ধর্মযুক্তা নারী' মাত্রই পত্নী। বৃষলী-কন্যাও পত্নী অর্থে গ্রহণযোগ্য। বৃষলী শব্দের অর্থ রজস্বলা কুমারী। এবং রজস্বলা কুমারীত্বই পাণিগ্রহণযোগ্য ধর্ম।

---

১০. Sex and Sex Worship, pp. 431-32

In ancient Assyria the bull was the actual male createror or progenitor of mankind; [.] when an apis bull died, another was sought by the priests [...]

When the new god was discovered he was taken to Nilopolis where he was specially housed and fed on milk for four months. When mature enough, he was taken to a ship, at a time of new moon, which was a festival in Egypt, and conducted in ceremonius state to the temple at Memphis, where for the first forty days after his arrival he was seen and attended only by women who fed him and exposed themselves to him by submitting to sexual union with him, for this was the custom with th bull at Memphis and the ram or goat at Mendes [ ]

Ibid. pp, 435-36.

Among the ancient Assyrians the goat was the symbol for sexual vigors and was worshipped as a 'lingam'-god or deity. The goat was also worshipped at Mendes, in Egypt, here men co-habited with she-goats and women with male goats or bucks in honor of Ram, who was the god of Mendes. He had no special name, but was simply called the Ram, but his worship was similar to that of the Apis god, but was not limited to a few privilaged women, but any women could restore to the temple and submit herself to one of the male goats, which had been trained to enjoy the unnatural union, or men could co-habit with female goats. This theme furnished a favourite motif for wall paintings in the bathrooms of Roman villas in Harculanium and pompeii.

১১. Dr. N. N. Bhattacharya: Ancient Indian Rituals and Their Social Contents. Delhi 1975. p.2.

কেবলমাত্র রাজমহিষীদের নয়, সমস্ত রজস্বলা কুমারীকন্যাদেরও অশ্বমেধের অশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে হত। "তারপর ধর্মকামনায় সুস্থির চিত্তে সেই অশ্বের সঙ্গে এক রজনী যাপন করলেন। হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা রাজার মহিষী এবং পরিবৃক্তিসহ বাবাতা ও অপরা পত্নীকে অশ্বের সঙ্গে যুক্ত করলেন।"[৯২]

অন্যদিকে আমাদের দেশে এখনও দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত একটি মন্ত্র আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। বস্তুত মন্ত্রটি বৈদিক যুগে অশ্বমেধ যজ্ঞকালে ব্যবহৃত হত। অশ্বমেধ যজ্ঞে নিহত অশ্বটিকে দেবতা হিসাবে গণ্য করা হয়। সেই মৃত অশ্বের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাজার পত্নীরা পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করে বলে ওঠে—'অম্বে, অম্বিকে, অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন।' এর বঙ্গার্থ এরকম দাঁড়াবে—'হে অম্বে, অম্বিকে, অম্বালিকে আমাকে অশ্বের নিকট কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। বোধহয় অশ্ব কাম্পিলনগরবাসিনী কোনো কামিনীর সঙ্গে শয়ন করছে'। (বাজসনেয়ী সংহিতা ২৩/১৮)। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে দুর্গাপূজাতে প্রাগুক্ত মন্ত্রটি এখনও অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।[৯৩]

(২) আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ অথবা নানাবিধ পূজামন্ত্রে এই ধরণের রাশি রাশি উদাহরণ পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরেও একই চিন্তার স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। '[...] গিলগামেশের সমসাময়িক সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত সীলমোহরগুলিতে খোদিত কতগুলি দৃশ্য আমাদের কাহিনীকে বিবৃত করতে পারে। চান্‌দারো সীলমোহরে একটি বলদ মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটি নারীর ওপরে পা তুলে দিয়ে আছে—এই চিত্রটি খোদিত আছে।' এই ঐতিহাসিক সীলমোহর বা 'দলিলে' আলোচ্য কাহিনীর মূলে পশু সম্পর্কিত যে পটভূমি রয়েছে, সঠিক রূপে সেটা অনুসন্ধান করলে একথাও আমরা বলতে পারি যে, আমাদের আলোচ্য কালের সমসাময়িক বৈদিক অশ্বমেধের ধর্মীয় অশ্বসম্ভোগের অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রাচীনতর এক বণ্ডগর্ত অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য আছে।[৯৪]

(৩) মহাভারতের যুগেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, গান্ধারীর বৈধব্য যোগ রয়েছে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে রেখেই

৯২. রাজশেখর বসু : বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)। কলকাতা ১৩৭৭। পৃঃ ১৭

৯৩. নৃপেন্দ্র গোস্বামী : বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। কলকাতা ১৩৭৭। পৃঃ ৫১

৯৪. ডঃ হাইনস্‌ মোডে : রাজা নাটকের লোককাব্যগত পটভূমি। সত্তর থিয়েটার। পৃঃ ১৩।

ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিয়ের আগে গান্ধারীকে একটি ছাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে।[১৫]

(৪) একই চিত্রের আভাস পাওয়া যায়, উত্তরবঙ্গের লৌকিক ব্যাঘ্রদেব সোনারায়ের পাঁচালীতে। নন্দ ঘোষের স্ত্রী যশোদা স্বপ্ন দেখেন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই পুত্র-কামনায় ধর্মের পূজা করেন। পূজার অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে—

ধবল পাটা আনে কন্যা গলে দড়ি দিয়া।

পূর্বমুখে ওচায় বাতি ধর্মক লাগিয়া॥[১৬]

অর্থাৎ কন্যা একটি সাদা রঙের পাঁঠা গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে এলেন এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে পুবদিকে বাতি উঁচু করে ধরলেন।

যে চিত্র আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যে, তারকুলে লয়ম অথবা পম্পিয়াইতে, সেই একই চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে ভারতে অশ্বমেধের ঘোড়ায়, চান্দুদারোর যণ্ডে, গান্ধারীর সঙ্গে ছাগ-বিবাহে অথবা সোনারায়ের 'ধবল পাটা'র অনুষঙ্গে। পৌরাণিক যুগে আরও একটি প্রাণীকে কুমারীকন্যাদের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায় সেটি একটি একশৃঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী।

(৫) 'সিন্ধু উপত্যকার ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিতে সরল শৃঙ্গবিশিষ্ট অশ্ব-জাতীয় এক প্রাণীর একাধিক চিত্রিত মূর্তি আমরা দেখতে পাই। [...] এই চিত্রের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ (এক শৃঙ্গবিশিষ্ট তপস্বী) বা একশৃঙ্গের বর্ণনা বেশ মিলে যায়। মধ্যযুগীয় খৃষ্টান এবং ঐস্লামিক সাহিত্য ও শিল্পে যে নিদর্শন আছে তাতে দেখা যায়, একশৃঙ্গ নামক একটা প্রাণীর সেই পুরাতন আখ্যানটি ভুলে যাওয়া হয়নি।' এর থেকে বোঝা যায়, একশৃঙ্গের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[১৭]

(৬) নলিনী অবদানে আছে—রাজা কশ্যপের কন্যা নলিনী বিবাহযোগ্য হলে রাজা তাকে ঋষি কশ্যপের আশ্রমে রাখেন। ঋষির মৃগীগর্ভজাত একশৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। নলিনী তাকে পিতৃগৃহে এনে পতিত্বে বরণ করে। পরে একশৃঙ্গী আরও বিবাহ করে।[১৮]

---

১৫ দৃষ্টিহীন : অভিনয়। শারদীয়া নবকল্লোল কলকাতা ১৩৮১। পৃ: ৫১।

১৬. ডঃ ফণী পাল : সোনারায়ের পূজা পাঁচালী ও প্রসঙ্গত: । (সোনারায়ের গান অংশ)। মালদহ ১৩৮২। পৃ: ৪।

১৭ ডঃ হাইনস মোড়ে : ঐ। নতুন থিয়েটার। পৃ: ১৬।

১৮. নীরদ মজুমদার : পুনশ্চ প্যারী। দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

বস্তুত পুরাণোক্ত, সাহিত্য-কথিত, পূজামন্ত্রে-দৃষ্ট অথবা সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহরে প্রাপ্ত নিদর্শন ছাড়াও ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে এই প্রচলিত রীতির সাক্ষ্য মিলবে। যারা খাজুরাহো মন্দির গাত্রে ঘোটকী-রমণরত পুরুষমূর্তি অথবা শ্বাপদ জন্তুর সম্মুখে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নগ্ন নারীমূর্তি লক্ষ্য করেছেন, তারাই এই উক্তির যথার্থতা অনুধাবন করতে পারবেন। শুধুমাত্র এই নয়। পশুগমনের এই আদিম লোকবিশ্বাস যে সভ্যতার ধারা অনুগমন করে বর্তমান অব্দি এসেছে এবং নানাবিধ কারণে গ্রাহ্য হয়েছে, তার প্রমাণও একটু লক্ষ্য করলেই পাওয়া যাবে।

(৭) 'হাওড়ার সুরকীকলের সন্নিকটবর্তী ডোবার ধারে ঘোটকী পীড়নের অপরাধে দুটি যুবক ধৃত হয়। [· ·] এ কাজ তারা কেন করে, তার উত্তরে একজন বলে, সে শুনেছে এতে বেমার সারে।' অথবা,

'টালিগঞ্জের রেলপুলের সন্নিহিত বস্তী এলাকায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে শূকরী ব্যবহারে প্রবৃত্ত এক ধাঙড় যুবককে ধরা হয়েছিল। সে বলে যে তাদের সমাজে এ ব্যাপার বহুল পরিমাণে চলিত আছে। তার কথায় এটাও জানা যায় যে, মেহ ও গর্মির চিকিৎসা হিসাবে শূকরী-নিয়োগকে ওরা প্রকৃষ্ট উপায় বলে মনে করে।'[৯৯]

পশুরা যখন দেবতা, তখন সুখী বিবাহিত জীবনের স্বপ্নে কুমারীকন্যাকে তার কুমারীত্ব উৎসর্গ করতে হয়েছে পশুর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। অন্যতর উদ্দেশ্যে ধাঙড় পল্লীতে অথবা অন্যত্র পশুগমনের চিত্র, বর্তমানকালে শূকরী/ঘোটকী পীড়নের অসামাজিক ঘটনাও লক্ষ্য করা যায়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দেবতা শুধু সন্তানই দেন না, অন্যান্য বিবিধ প্রকারের অমঙ্গলের সঙ্গে ব্যাধি-মুক্তির পথও দেখিয়ে দেন। একারণেই পশুপালনমূলক অর্থনীতির স্তরে মানুষের ধর্মীয় চিন্তা এধরণের পাশবিকতার স্তরেই ছিল, এই সহজ সত্যকে উপেক্ষা তা অস্বীকার করে লাভ নেই। উৎসে এই ধ্যানধারণা থাকলেও মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগুলোকেই পরিশীলিত করেছে। আদিম জীবন এবং তজ্জাত ধর্মীয় চিন্তার আদিমতা থেকে সে মুক্তির পথ খুঁজে বার করেছে, কুৎসিতকে পেছনে ফেলে সে সুন্দরের আরাধনায় প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে।

৯৯. সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার। ঐ। পৃঃ ৬।

ধীরে ধীরে দেব-চিন্তায় বিবর্তন এল। দেবতারা মূল পশুমূর্তি পরিত্যাগ করতে লাগলেন। মধ্যন্তরে অর্ধপশু এবং শেষে মনুষ্য-মূর্তিতে। মানুষ বলল, 'আমি আপনমনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা। তুমি আমারই।' দেবতার কাছে সোজাসুজি প্রার্থনা—'আমাদের বংশবৃদ্ধির সহায়ক হও। পশু ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ কর'। রক্ত এবং মাংসের পান প্রতীকিত হল। বৈদিক যজ্ঞে ইডা ও পুরোডাশ, হিন্দুর পূজায় ঘৃতমধুর উপাচার, খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানে রুটি ও মদ্য। রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুসারে রুটি ও মদ্য যীশুর রক্তমাংসে রূপান্তরিত হয়, যেমন পশুমাংসরূপে পুরোডাশকে কল্পনা করবার রেওয়াজ ছিল বৈদিক আমলে।[১০০] এর কারণ, কাঁচা মাংস খাওয়ার (রেড ইণ্ডিয়ানদের কুমারীপূজার উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য), পুড়িয়ে চর্মপাত্রে সেদ্ধ করার (মাংসকে চর্মপাত্রে রেখে জল দিয়ে, তাতে ডগডগে আগুনের শিখায় উত্তপ্ত পাথরকে সেই পাত্রে ফেলে দিয়ে) আদিম রন্ধনপ্রণালী আয়ত্ত করে আদিম খাদ্যাভ্যাস থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে মানুষ।

বৈদিক আচারে যজ্ঞীয় চরুভক্ষণও সেই পুরুষ-প্রকৃতির দেহরসেরই প্রতীকিত রূপ।

> তাহাতে (সেই ঘৃতপক্ব চরুতে) যে ঘৃত থাকে তাহা স্ত্রীর পয়ঃ শোণিত স্বরূপ), তার যে তণ্ডুল আছে তাহা পুরুষের (রেতঃ স্বরূপ), সেই ঘৃত তণ্ডুল মিথুন সদৃশ, সেইজন্য এই মিথুন দ্বারাই (ঘৃততণ্ডুলময় চরু প্রদানদ্বারা), ইহাকে (যজমানকে) সন্ততিদ্বারা ও পশুদ্বারা বর্ধিত করা হয়। (অনুবাদ শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। মূলমন্ত্রটির ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্জিকার প্রথম অধ্যায়ে আছে)।[১০১]

বৈদিক অনুষ্ঠানে যা পরিশীলিত রূপ ধারণ করেছে, তন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আচারে সেগুলি আদিম স্তরেই রয়ে গেছে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঠাঙ্গরিয়া মহাপুরুষিয়াদের, বীজমার্গীদের আচার আমরা আগেই দেখেছি। এবার অন্য আর একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> বিকৃত তন্ত্রাচারের তালিকা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পাঁচজন কৃষ্ণকায় নারী থেকে পঞ্চপ্রকারের ক্লেদ সংগ্রহ করে, তার ন্যাকড়া 'পঞ্চপুষ্প' নামে ব্যবহার

১০০. বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। ঐ।

১০১. লোকায়ত দর্শন। ঐ। পৃঃ ১১১।

করা অর্থাৎ অঙ্গে ধারণ করা, যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া, প্রদীপ জ্বালিয়ে দেহ ও গৃহের আরতি করা, ইত্যাদির বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করা গেছে। এছাড়া মূত্রপান, শুক্র সেবন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদি লেহন, মুণ্ডিত গুপ্তকেশের ভস্ম ত্রিপুণ্ড্ররূপে ললাটে ধারণ, এমনকি পশুগমনও কোন কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষ তন্ত্রাচাররূপে অনুষ্ঠান করে, তার সংবাদ আছে।[১০২]

পশুগমনের উদাহরণ আমরা কিছু আগেই দিয়েছি। উদ্ধৃত অংশ থেকে এটাও দেখতে পাচ্ছি পশুগমন তন্ত্রসাধনায় সাধনপন্থা রূপে গৃহীত। বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, লোকবিশ্বাসে এদের রূপ কি রকম ছিল তাও দেখেছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—এগুলি কি প্রথমাবধি বিকৃত-চিন্তার ফসল? মূত্রপান, শুক্র সেবন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদি লেহন এগুলি কি প্রথম স্তরেই বিকৃত কামনাতৃপ্তির চিন্তাজাত? আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। আগেই উল্লেখ করেছি যে একজন শ্রদ্ধেয় অভিধানকার 'পশ্বাচার' শব্দটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যা বৈদিকাচার তা-ই পশ্বাচার। বলেছেন, এগুলো তন্ত্রোক্ত আচারবিশেষ।

তন্ত্রোক্তই হোক, বৈদিকই হোক, আর মধ্যপ্রাচ্যেরই হোক—আধুনিক রুচির কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক এই আচরণগুলি মানুষ শিখেছে কোথায়? এর উত্তরে আবার সেই কথাই বলব যে পশুদের আচরণই পশুপূজা-যুগে আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে, দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক হবে বলেই উল্লেখ করা যাক।

> আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথায় খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা, ডাক্তারের মত সরু ল্যানসেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়।

আজকের দেবদেবীমূর্তি, আরাধনাপদ্ধতি, পূজা-উপকরণ এবং দার্শনিকতাকে বর্তমানের আলোকে বিচার করলে সত্যই ভক্তি এবং প্রেমের প্রসাদে "হৃদয়ের শোণিত" "বাহির হইয়া যায়"। কিন্তু এ বর্তমানের উৎস তো বর্তমান বা নিকট অতীত নয়—এ যে সুদূর, অতি-সুদূর অতীতের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে বর্তমানের বিরাট

---

১০২ সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার। ঐ। পৃঃ ৩৯-৪০।

ধারায় প্রবাহিত। তাই একে সেই যুগের মানসিকতা এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানসিকতা বিকাশের সম্ভাব্য স্তরের ভিত্তিতেই বিচার করতে হবে। এবং যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির তথা যুক্তিবাদী মননশীলতার আলোকে দেখার চেয়ে দৃষ্টবস্তুর অনুকরণের মধ্য দিয়েই মানুষ সবকিছুকে মূলত গ্রহণ করেছে, তাই পূর্বোক্ত প্রবন্ধের আরও একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

> দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। [ ] জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারেন। [ ] তাই আমরা একটা গন্ধ তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই — রুচির মুখরক্ষা করিতে গেলে, ছেঁদা তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাঁদ পাইতাম।[১০৩]

সৃষ্টির যুগরুচির সঙ্গে আলোচ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাত ছিল না বলেই, আমরা 'ছেঁড়া-কাটা-ভাঙ্গা' কিছু পাইনি। আর সে যুগের ধর্মীয়চিন্তার উদ্ভাবক, ধারক এবং বাহকরা দীনবন্ধুর মত 'সহানুভূতিশীল' ছিলেন বলেই, 'জীবিত আদর্শ সম্মুখে' রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রেখাঙ্কন তথা ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছিলেন।

আগেই দেখেছি পশুদের তা-যুগের অনুষ্ঠানগুলি পশ্বাচার। মূত্রপান, শুক্র-সেবন, নিষিদ্ধ অঙ্গাদিলেহন এর প্রত্যেকটিই 'জীবন্ত আদর্শ' পশুদের তাদের জৈবিক আচরণ। স্বমূত্র অথবা সন্তানমূত্র অথবা দয়িত দয়িতার মূত্রলেহন তথা পান, মিলনের পর অথবা জন্মের অব্যবহিত পরেই শাবকের দেহ কিংবা নিজেদের জননাঙ্গদেশ লেহন করে পরিষ্কার করার স্বাভাবিক আচরণ আমরা বিভিন্ন পশুর মধ্যে প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছি। দ্বিহস্ত-বিশিষ্ট মানুষ পতঙ্গ তাড়নের জন্য ব্যজন ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু পশুরা তার পরিবর্তে সলোম পুচ্ছতাড়নার দ্বারা সে কাজ করে থাকে। সাধারণ অবস্থায় স-পত্র শাখা অথবা গামছা অথবা তালপত্র ব্যজন ব্যবহৃত হলেও দেবপূজায় চমরীগরুর লেজ কেটে তাকেই ব্যজন হিসাবে ব্যবহারের রীতিকেই কি আমরা প্রশস্ততম বলে বিবেচনা করিনা? পীর ফকির

১০৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সমালোচনা সংগ্রহ, (দীনবন্ধু মিত্র) ক. বি. কলকাতা ১৯৭৮। পৃঃ ২০৬-২১০।

অথবা পাঁচালী-গায়ক, রামায়ণ-গানকারী নট-নটি যখন ছড়া কাটা বা গান গাওয়ার পরে দেবতার আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য ভক্ত শ্রোতার মস্তকে অথবা অঙ্গে হাতের চামরটি বুলিয়ে দেন তখন কি একবারও আমাদের মনে আসে সে এটা পরিশীলিত কিন্তু মূলত পশু-আচরণ ? তা হয় না। তার কারণ চামরবীজন আমাদের মনে আনে পবিত্র তৃপ্তির ভাব। অন্যদিকে মূত্র শুক্র পানলেহন অথবা নিষিদ্ধ অঙ্গলেহনকে যখন বিশেষ শ্রেণীর দেব-আরাধনার অঙ্গ হিসাবে দেখি তখন তাকে বর্তমানের আলোকে বিচার করে ঘৃণা এবং ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠি। একবারও ভেবে দেখিনা যে রস যুগের মানুষ পশুকে দেবতার আসনে বসিয়ে, জীবন্ত আদর্শকে সামনে রেখে দেবতারই তৃপ্তি সাধনের মধ্য দিয়ে তাদের আশীর্বাদ কামনার অনুষ্ঠানসূচি অঙ্কন করেছেন, যেনবা "তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া" নিয়েছেন। তা ছাড়াও, দেবপূজাতেই হোক, জীবন-আচরণের ক্ষেত্রেই হোক অথবা গল্পকাহিনী বা লোক-কথাতেই হোক, আদিমতম স্তরের অনেক আচার-আচরণই পরবর্তী, পরিবর্তিত উন্নততর অবস্থাতেও থেকে যায়। মনে রাখা দরকার যে মানুষও মূলত পশুজীবনযাপন এককালে করেছে। সেই জীবনের সমস্ত অভ্যাসকেই পরবর্তী স্তরে এসে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছে, এমন ভাববার কোনো যুক্তি নেই।

আমার উপরিউক্ত বিস্তৃত আলোচনা থেকে যদি কোনোভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি স্বাভাবিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য বলে আমি মনে করি, তাহলে বর্তমান প্রবন্ধকারের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে, তাকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হবে। আমিও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছি এগুলো অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রসূত, দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত ক্ষতিকর আচরণ। এগুলো থেকে কতকগুলো দুরারোগ্য ব্যাধি সংক্রমণের সম্ভাবনাই রয়েছে বেশি। তাছাড়া পশুর সব আচরণ মানুষের (হোক না সে দেবপূজায়) গ্রহণীয় নয়।

মানবেতর চতুষ্পদ জন্তুরা চারিটির মধ্যে সামনের দুটো পা-কে ক্ষেত্রবিশেষে হাতের মত ব্যবহার করতে পারলেও (বিড়াল, কুকুর বা এই জাতীয় প্রাণীর ক্রোধ প্রকাশে বা গর্ত তৈরিতে, ছাগলের উঁচু ডালা থেকে পাতা পেড়ে খাওয়ার সময় সামনের পা দুটোকে হাত হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়), দেহ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এ দুটো তাদের কোনো কাজেই লাগেনা। তাকে এর জন্য জিভকেই ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে আলোচ্য পশ্বাচারগুলো পশুকুলের জৈব-আচরণের অঙ্গীভূত। এগুলো অনুকরণ করে মানুষ নিশ্চয়ই কোনো দিক থেকে

নিজেকে উন্নত করতে পারেনি। বরং নিজের ক্ষতিসাধন করেছে এবং যেটা ধর্মীয় আচরণের নামে আজও করছে।

প্রসঙ্গটির আলোচনা এইজন্যই করা হল যে এই সমস্ত আচরণের উৎস আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা বলেই এগুলোকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'পারভারশন' বা বিকৃতি বলছি। মলে এগুলো যে বিকৃতজাত ছিল না, ছিল পশুপালন যুগের, বা তারও বহু আগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, তাই তুলে ধরার চেষ্টায় এত কথা বলা।

পুষ্পে ৎ'ব ও উর্বরতা

যাই হোক, নরনারীর দেহরসের প্রতীক যে চরু হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হত, পুত্রাকাঙ্ক্ষিনী নারী সেই চরুই ভক্ষণ করতেন। আবার হিন্দু বা পূর্ববঙ্গের খ্রীষ্টান বিবাহে[১০৪] অথবা বর্দ্ধমান অঞ্চলে মুসলমান বিবাহে বর কনেকে যে ক্ষীর খাওয়ানোর অনুষ্ঠান[১০৫] দেখা যায়, তা-ও মূলত একই চিন্তাজাত বলে মনে হয়।

দেবতারা এবং দেবভক্তরা প্রসাদরূপে যা গ্রহণ করেন তা মৌলিক চিন্তায় হত-পশু বা কুমারীকন্যার কণ্ঠ-কবন্ধ রুধির ছিল না। সেটা ছিল প্রজনন এবং বংশ তথা গোষ্ঠীবৃদ্ধির চিন্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত কুমারীকন্যার দেহরস। তাই রাজবল্লভ রুধির গ্রহণ করেন স্ত্রীচিহ্ন যুক্ত গৌরীপট্টাকৃতি খর্পরে। ত্রিঙ্গকের বেতাল মহারাজের কবন্ধশোণিতে রুচি নেই, তাঁর অর্ঘ্য কুমারীর যৌন-অঙ্গের রুধির। খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধির একই কামনায় রেড ইণ্ডিয়ানরা কুমারীবলির রক্তে ধরিত্রীকে ঋতুমতী করার অভিনয় করে, শস্যবীজকে রুধির সিক্ত করে। বঙ্গদেশে বর্ধমান অঞ্চলের কাটাধানের গাছের গোড়ায় সিঁদুর মাথা তুলে রাখা হয়।[১০৬] পৃথিবীর ঋতুমতী হওয়ার উৎসব অম্বুবাচীতে লোক-প্রবাদ অনুযায়ী আঘাত করা বর্তমানকালে নিষিদ্ধ হলেও এককালে তা ছিল না।

১০৪. নরেন্দ্র ডি' রোজারিও: পূর্ববঙ্গের খ্রীষ্টান বিবাহে লোকাচার। বিবাহের লোকাচার। ২য় সং কলকাতা। ১৯৮২।

১০৫. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন সাহিত্যবিনোদ: মুসলমান বিবাহে লোকাচার লোকসংস্কৃতি, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৪, কলকাতা।

১০৬. লক্ষ্মী: আশা থেকে আশ্বিনে। প্রাগুক্ত। পৃ: ৩১।

কামাখ্যার যোনিপীঠে কৃত্রিম ঋতুশোণিত সৃষ্টি করে, [...] হলচালনা রূপককে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে।[১০৭]

মূলত এই জাতীয় কোনো উৎসবই যে উৎসে শস্যোৎসব ছিল না তার প্রমাণ উপরিউক্ত উদ্ধৃতিটি। কামাখ্যা মন্দির বা কামাখ্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা তো কৃষি-উৎসবকে বা চিন্তাকে কেন্দ্র করে হয়নি। এটি তো ভারতীয় তন্ত্রসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। তবু কেন হলচালনা ?

কামাখ্যার যোনিপীঠে যে কৃত্রিম ঋতুশোণিত সৃষ্টি করা হয় তাকে ভক্তরা অতি পবিত্র মনে করেন, যদিও বর্তমান কালে তথাকথিত সভ্য বা অসভ্য জাতিগুলোর প্রায় অধিকাংশই দেশেই ঋতুকালীন নারীকে অপবিত্র, এমন কি অস্পৃশ্যা বলে মনে করে।

অন্যদিকে, তন্ত্রমতে নারীকে নারীর রক্তকে, বিশেষত, ঋতুমতী নারীকে বিশেষ পবিত্র বলে মনে করা হয়। তান্ত্রিক হোমে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান করে নেবার প্রথা আছে। এককালে আদিম মানুষের মধ্যেও নারীর রক্ত পবিত্র বলে ধারণা ছিল।[১০৮]

আদিম সমাজব্যবস্থায়, তন্ত্রসাধনায় নারীর সৃষ্টিশোণিত পবিত্র কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ব-পেডি (Ba-padi) জনগোষ্ঠীর এতদ্ সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং অনুষ্ঠানে।—

পশুপক্ষী শিকার-পালন এবং নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ জেনেছিল যে মাতৃগর্ভে শিশুর প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় রক্তের ডেলা আকারে। অর্থাৎ, প্রাথমিক স্তরের ডিম্বকোষ রক্তপিণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। এই রক্তপিণ্ডই ধীরে ধীরে শিশুদেহে রূপান্তরিত হয়।

ব-পেডি জনগোষ্ঠীর মানুষ এই রক্তকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। সন্তানের দেহ গঠিত হয়নি, এমন অবস্থাতে তাঁর গর্ভপাত হলে স্বভাবতই প্রসূতি সেই রক্ত লুকিয়ে ফেলে। এই আচরণ ঐ গোষ্ঠীর বৈদ্য (medicine-man) এবং বৃষ্টি নামানোর পুরোহিতের (rain-maker) দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভয়াবহ অশুভ সংকেতবাহী। তারা মনে করে, এটা করে গর্ভপাতকারিণী নারী অজাত শিশুকে লুকিয়ে ফেলেছে।

১০৭. সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার। ঐ। পৃঃ ৬।

১০৮. A. A. Macdonell : Lectures on Comparative Religion, Calcutta 1925, p. 17.

ফলে, সমস্ত দেশ জুড়ে গরম হাওয়া বইবে, দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। আর বৃষ্টি নামবে না, দেশের অবস্থা অস্বাভাবিক হবে। যেখানে রক্ত লুকিয়ে রাখা হয়েছে মেঘ তার কাছে যেতে ভয় পাবে। সে দূরে সরে যাবে। নারীটি বিরাট অপরাধ করেছে। সে গোষ্ঠীপাতর দেশকে রসাতলে পাঠাচ্ছে। কারণ এই শোণিত পথে পড়ে অস্পৃশ্য হয়েছে।

এমন অবস্থায় গোষ্ঠীপতি তার সমস্ত লোকজন ডাকবে। তাদের জিজ্ঞেস করবে— গ্রামে তোমরা সুখে-শান্তিতে আছ? জনতার মধ্য থেকে কেউ একজন বলবে— অমুক নারী গর্ভবতী ছিল। তার সন্তানটি তো দেখতে পেলাম না।

মেয়েটিকে এনে, কোথায় পাতিতগর্ভ-শোণিত লুকিয়ে রেখেছে তা বের করবে। এরপর বৈদ্য দু' জাতীয় শেকড়ের কাথ একটা বিশেষ পাত্রে তৈরি করে, গর্ত খুঁড়ে সেই রক্ত বের করে, সেই গর্তে সেই কাথ ছিটিয়ে দেবে। এরপর মাটি শুদ্ধ সেই রক্ত নদীতে ফেলবে। নদী থেকে জল এনে গর্তটি ভাল করে ধুয়ে দেবে। নারীটিও তৈরী করা কাথ দিয়ে রোজ নিজেকে পরিস্কার করবে। এটা করলেই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার জন্য বৈদ্য তখন দেশের নারীকুলকে ডাকবে। তারা এসে গর্ভপাতিত রক্তসমেত একটা মাটির পিণ্ড তৈরী করবে। সেটি তারা সকাল বেলায় বৈদ্যর কাছে আনবে। এটা দিয়ে বৈদ্য দেশকে পবিত্র করার ওষুধ তৈরি করবে, মাটির ডেলাটি গুঁড়ো করে।

পাঁচ দিন পরে, কিছু ছোট ছেলে এবং অজাত-ঋতু, নারী-পুরুষের মিলন সম্পর্কে অজ্ঞ একটি মেয়ের হাতে ষাঁড়ের শিঙে সেই ওষুধ পুরে, তা নিয়ে প্রত্যেকটি জলাশয়ে, গ্রামে ঢোকার প্রতিটি রাস্তায় ছড়িয়ে দেবার জন্য পাঠাবে। মেয়েটি ছোট্ট কুড়ুল দিয়ে শিঙের ভিতরকার মাটি (রক্ত সমেত) আলগা করবে তার ওস্তুরা গাছের ছোট ছোট পল্লব সেই ধুলোতে ডুবিয়ে ছড়িয়ে দেবে, আর বলবে—বৃষ্টি, বৃষ্টি। ছড়াবে সেই গর্তটিতেও, যাতে পাতিত-গর্ভ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

এমনি করেই ওরা অপরাধের অভিশাপকে দূর করে দেশকে পবিত্র করে।[১০৯]

উল্লিখিত এই ব্যাপারে স্পষ্টতই সৃষ্টি শোণিতকে এত পবিত্র মনে করা হয়েছে যে, তার আকর্ষণে বৃষ্টি নামবে বলে তারা মনে করে।

প্রসঙ্গতই পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নীলনদে কুমারী উৎসর্গের পূর্বোল্লিখিত

১০৯, Golden Bough, p 276.

ঘটনাটিকে। সেখানে ফ্রেজার স্পষ্টতই ব্যাখ্যা রেখেছেন,—এই কুমারী উৎসর্গ, জলদেবতার পুরুষ শক্তির সঙ্গে কুমারীকন্যার মিলনে জলস্ফীতির তথা সৃষ্টির তথা বৃদ্ধির জন্ম।

কিন্তু কুমারীকন্যার সঙ্গে বিভিন্ন কল্পিত দেবতার মিলন বা তাদের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে কুমারী বা নারীঘাতনের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তার স্পষ্ট বক্তব্য এবং প্রমাণ পাওয়া যায় ব-পেডি (Bapadi) গোষ্ঠীর এই আচরণ ও অনুষ্ঠানে।

আগেও বলেছি এবং, বর্তমানের রূপে প্রচলিত অনেক লৌকিক উৎসবকে কৃষি-উৎসব বলে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় বলেই সেগুলিকে প্রায় নির্বিচারে কৃষি-উৎসব বলে আমরা অনেকেই চিহ্নিত করেছি। কিন্তু এগুলো মূলে ছিল পশু ও মানব প্রজননকেন্দ্রিক উৎসব। উৎসচিন্তা ভুলে তাই দেহরসের প্রতীক রুধির সংগৃহীত হতে থাকল নিহত পশু বা মানুষ থেকে। অনেকটা যেন হিন্দুর পূজাপদ্ধতিতে 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'-এর মত ব্যাপার। আসলে কবে কোন অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে এদের জন্ম মানুষ তা ভুলে গেছে কালের প্রবাহে। তাই দেহরসের স্থান নিয়েছে কণ্ঠ-রুধির। আমরাও প্রাপ্ত উপাদান-অনুষ্ঠানের স্থূল দিকটাকে বিচার্য বিষয় বলে ধরে নিয়ে, একে কখনও বলেছি আদিম বিশ্বাস, আবার কখনও বলেছি কৃষি বা অন্যান্য বিষয়ক যাদু। 'শাক্তচর্চার বর্তমান রূপ দেখে ঠিক আদি রূপটি ধরা যায় না। এর বাহ্যিক উপকরণ হচ্ছে মাতৃকামূর্তি বা নারীবিগ্রহ, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরাকালীন উর্বরতাসংক্রান্ত যাদুবিশ্বাস।'[১১০] কিন্তু যে আদিম মানুষ যাদুই জানতো না, তা বিশ্বাস করবে কি করে? যাদু এসেছে মানবসভ্যতার অনেক পরে। যখন ধর্মীয় বা সামাজিক বা অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে, জটিলতা বেড়েছে, তখনই মানুষ মূলকে ভুলে গেছে। সেইসময় অনুষ্ঠানের ভুলে যাওয়া উৎসের ব্যাখ্যায় জনগোষ্ঠীর তথা সমাজের বুদ্ধিমান-শ্রেণীর নতুন দৃষ্টিকোণ আনল। এরই ফলশ্রুতি যাদু। তবে একথা ঠিক যে, এই শ্রেণীর হাতে পড়ে বিস্মৃতমূল, উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক নতুন ধরণের বিদ্যা-সাধনার জন্ম হল। এবং এইগুলিই যাদু। অনুষ্ঠান বা আচারের মূলে কোনো যাদু ছিল না।

কখনও দেখা যায় কোনো একটি বৃহদাকৃতি বলবান পশুর চিত্র আছে, তার বক্ষদেশে হৃৎপিণ্ডের স্থানটি একটি বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। ছবিতে দূরে শিকারী তীর নিক্ষেপরত। সামগ্রিকভাবে গুহা চিত্রটিকে যাদু বা ম্যাজিকের উদাহরণ

১১০. বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। ঐ। পৃঃ ৪০।

হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে যাদু কোথায় তা বোঝা মুস্কিল। বৃক্ষ-কোটর অথবা গুহাবাসী আদিম মানব তীরধনুক আবিষ্কার করেছে। এই আবিষ্কারের পরে বহু শতাব্দী বা সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে যে বক্ষদেশের চিহ্নিত স্থানে প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্রটি থাকে। একবার যে-কোনো উপায়ে হোক সেই স্থানটিতে তীক্ষ্ণ শরাঘাত করতে পারলে প্রাণীটির মৃত্যু এবং নিজেদের খাদ্যপ্রাপ্তির পথ সুগম হবে। তাই শিক্ষার্থী তীরন্দাজকে গোষ্ঠীপতির শিকারে তালিম দেওয়ার চিত্র এটি। এর মধ্যে যাদু কোথায়? শিকারের এই শিক্ষার যে প্রচলন ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলবে দ্রোণাচার্যের, কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্রপরীক্ষায়। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষার চেষ্টা হয়েছে কৃত্রিম 'ভাস'কে গাছের ডালে বসিয়ে। অন্যদিকে গুহামানব নিজের বাসস্থানের দেওয়ালে এঁকেছে এই চিত্র। তফাৎ কেবল এইখানে। তফাৎ রয়েছে তার কারণ মহাভারতের যুগ আলোচ্য চিত্রের যুগকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। কাজেই দ্রোণাচার্যের গৃহীত অস্ত্র পরীক্ষা যদি যাদু না হয়, তবে এই গুহা চিত্র যাদুপ্রসূত এই ধরণের চিন্তার যৌক্তিকতার ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়।

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, যদি যাদু জটিল জীবনচর্যায় ফসল, তবে যারা সহসা সভ্যজগতের কাছাকাছি আসে না, আফ্রিকার সেইসব গভীর অরণ্যচারী হিংস্র নরখাদক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও এই যাদু দেখতে পাওয়া যায় কেন? ত্রিম্বকের মশানযোগী তান্ত্রিকরা যে 'ভানমতী' বিদ্যা জানে, তার উৎস এবং আফ্রিকার অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর যাদু প্রহেলিকার উৎসও সেই একই স্থানে হওয়া সম্ভব।

'যাদু'-র ইংরাজী প্রতিশব্দ 'ম্যাজিক'। শব্দটির আভিধানিক আলোচনা এবং ঐতিহাসিকদের মতামত অনুযায়ী, যাদুবিদ্যার জন্ম পারস্যের 'মেডিয়ান' জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এদেরই পুরোহিতশ্রেণীর নাম ছিল 'ম্যাগাস্'। ম্যাগাস্ বা ম্যাজাস্ শব্দটি গ্রীকভাষায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক। প্রাচীন পারস্যভাষায় শব্দটি ছিল ম্যাজু-শ্ বা ম্যাগু-স্। আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসবেত্তাগণ পৌত্তলিক যাদুকরদের সম্বন্ধে শব্দটি প্রয়োগ করেন।[১১১] জরোস্থ্রুস্ত্রীয় ধর্মের পুরোহিতকে ম্যাজি (বা ম্যাগি?) বলে।[১১২]

১১১. The Compact Edition of the Oxford English Dictionary.
১১২. The Concise English Dictionary, London 1914.

পারস্তের সঙ্গে প্রাচীন ভারতেব যোগাযোগের মতনই আফ্রিকাব বিভিন্ন জনগোষ্ঠীরও যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া অরণ্যচারী আফ্রিকার বিভিন্ন লোক-সমাজ যেমন শিকারজীবী, তেমনি ছিল প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণ। কাজেই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন মানুষের বহুদিন থেকেই। এবং গোষ্ঠী-চেতনায় পৌরোহিত্য-চিন্তার ফসল যাদুবিদ্যা। কি ভারতীয়, কি আফ্রিকান, কি পৃথিবীর অন্যত্র—সবএই যাদুবিদ্যা। অথবা 'ভানমতী'র খেলার সঙ্গে সম্পদ্‌চিন্তা যুক্ত। আর ধীরে ধীরে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যতই জটিলতা দেখা দিল ততই এই চিন্তা এবং বিদ্যায় বিভিন্ন জটিল জিনিসের অন্তর্ভুক্তি ঘটতে থাকল। একদিকে যেমন বিস্মৃতমূল অতীতকে নিয়ে শুরু হল যাদু, অন্যদিকে তেমনি শিকার পশুপালন এবং প্রজননমূলক অর্থনীতির জীবন অতিক্রম করে মানুষ যখন কৃষিনির্ভর জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হল তখন থেকেই এইসব প্রাচীন দেব-সমাজেব চরিত্রেব মৌলিক দিকগুলোর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে হ্রাস পেল। অতএব এইসব প্রাচীন দেবতারা বিভিন্ন আচার-বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষেব চেতনাব গভীরে এত দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন যে, তাদের স্থানচ্যুত কবে কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর কোনো নতুন দেবতার পরিকল্পনা মানুষ করতে পাবল না। পশু-পাখি অথবা সরীসৃপকেন্দ্রিক দেববাদ সম্পর্কিত বহুদিনেব দৃঢমূল ধাবণাকে উৎপাটিত করে নতুন দেবপরিকল্পনা আর সম্ভব হল না বলেই হয়ত, প্রজননমূলক প্রাচীন দেবতাবাই নতুন বিশেষণে, নব নব পূজা-অর্ঘ্যে (পুরাতনের রেশও থেকে গেল তাতে), নবতব অনুষ্ঠানে, ক্ষেত্রবিশেষে নতুন নতুন নামে অনেকক্ষেত্রে কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে নিজেদেব সুন্দবভাবে খাপ খাইয়ে নিলেন। এমনকি, আরও পরবর্তীকালে পরিশীলিত চিন্তাব সংযোজনে এঁদের অনেককে কেন্দ্র কবেই উচ্চ দার্শনিকতাব জন্ম হল। কিন্তু আদিম এবং প্রাচীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হল না, হওয়া সম্ভবও নয়। উৎসকে ভুলে যাবার ফলেই আদিম রীতিনীতিগুলিও ভুল ব্যাখ্যায় (ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক বিবর্তন এবং অনেকাংশে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে), নতুন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করার ফলে মূলকে বুঝতে অসুবিধা হতে লাগল (এক্ষেত্রে ভাষা তথা শব্দার্থের পরিবর্তন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থের আমূল পরিবর্তন এর অন্যতম কারণ)।

যেহেতু শিকার, পশুপালন এবং প্রজনন অর্থনীতির যুগে এইসব দেব-পরিকল্পনা হয়েছিল, তাই মিলন প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পূজা পদ্ধতির অঙ্গ হয়ে গেল। শিকারজীবনে খাদ্যপ্রাপ্তির কাল ছিল মিলন ঋতু। (শিকারীরা

লক্ষ্য করেছিল প্রাণীরা যখন যৌন-মিলন নিয়ে ব্যাপৃত থাকে তখন তারা বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয় এবং সেই সময়ে তাদের শিকার করাও সহজ। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যারা হারপুন দিয়ে কচ্ছপ শিকার করে তারা কচ্ছপের সঙ্গমকাল এলে খুব খুশী হয়।[১১৩] আদিম শিকারের প্রকৃষ্টতম মুহূর্ত তাই মিথুনাবস্থা। মিলনই নতুনতর প্রভূততর খাদ্য—পশুশাবক দিতে পারে। এই অভিবাস্তব অভজ্ঞতারই প্রতিফলন দেখি কৃষিকর্মে মৈথুন-অনুষ্ঠানে। অথচ কাম্যাখ্যার উল্লিখিত উদ্ধৃতি এবং অপর একটি ঘটনার উল্লেখ যেমন, ইউরোপের কোনো কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে 'শ্রোভ'-মঙ্গলবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে হলচালনা নিষিদ্ধ দেখে এটিকে লিঙ্গ উপাসনার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে[১১৪] ইত্যাদি-ই প্রমাণ করবে যে এগুলি মূলে কৃষি-অনুষ্ঠান ছিল না। উৎসে হয়তো ঘটনাটি ছিল উল্টো।

এতে যাদু নেই। যেটা রয়েছে সেটা মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার অস্থানিক প্রতিফলন মাত্র।

ছাড়া, পশুসম্পদ এবং প্রাকৃতিক তথা বনজসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে যখন মানুষ নিজেদের দলপতি নির্বাচন করতে শিখেছে, তখন সেই গোষ্ঠীপতির মূল দায়িত্ব থাকে। নিশ্চিন্ত আশ্বাসের উপযুক্ত পথে অধীনস্থ জনগোষ্ঠীকে পরিচালিত করা। তাই আর অভিষেকেও মৈথুন। আফ্রিকার রাজ-অভিষেকের পবিত্র আগুনের কাহিনী দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন উৎসবে, আদিম স্তরের পূজাপদ্ধতিতে মৈথুন ও বলি, বলির রক্ত ও মাংসের পান-ভোজন মিলে মিশে একাকার। এছাড়া, আরও একটি অযৌক্তিক অনুকরণের সংস্কার মানুষের মনে কাজ করতে দেখা যায়। সেটা হচ্ছে, নিহত প্রাণীর যে নির্দিষ্ট অংশ খাওয়া যায় তারই গুণ পাওয়া যায়—এই বিশ্বাস। রেড ইণ্ডিয়ান পুরোহিতের বলি-প্রদত্ত কুমারীর হৃৎপিণ্ড ভক্ষণ অথবা ভারতীয় বিশেষ পূজাপদ্ধতিতে ঋতুরক্ত বা শুক্রপানের বীজও একই চিন্তাজাত।

১১৩ মানব ইতিহাসের সন্ধানে (The Story of Man Carleton S Coon): অনুবাদ, রবীন্দ্রনাথ সরকার। কলকাতা ১৯৬৬।

১১৪ William Crooke The Popular Religion and Folklore of Northern India, Delhi 1968, P 192.

The carrying about the plough and the prohibition common in Europe moving it on Shrove-Tuesday and other holidays, have like many other images of the same class, been connected with Phallicism

আগেই বলেছি, পূজায় বলির রক্তের মূলটি ছিল দেহরস। কুমারীর ক্ষেত্রে শোণিতরূপী দেহরস থাকা সম্ভব প্রাকৃতিক অথবা জৈবিক নিয়মেই। কিন্তু আমাদের দেশে তো সাধারণত স্ত্রী-পশু বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত দেখি না। কেবলমাত্র পুরুষ-পশুই বলি দেওয়া হয়। তা হলে কি বলির রুধির আর ঋতুরজের মধ্যে অভেদ-চিন্তা কষ্টকল্পনা? তা কিন্তু নয়। প্রাচীন রোমে পুরুষ-দেবতার কাছে পুরুষ-পশু এবং নারীদেবতার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পশু বলি দেওয়ারই রীতি ছিল।[১১৫] আমাদের উল্লিখিত গ্রীসের কাহিনীতেও দেখি দেবী আর্তেমিস ইফিজেনীয়ার পরিবর্তে মৃগ নয়, মৃগী বলি চান। কণ্ঠ-রুধিরে যদি তাঁর তৃপ্তি তবে মৃগী কেন? মৃগ-মৃগীর কণ্ঠরুধিরে কি কোনো পার্থক্য আছে? মধ্যপ্রাচ্যেও এই রীতি বর্তমান ছিল। আমাদের দেশে এখনও স্ত্রী-পশু বলির যে রীতি আছে, তা পরে বলব।

স্ত্রী-পশুর রক্ত না হয় ঋতুরজের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুরুষ পশুতে বা মানুষে এ জিনিস কোথায়? উত্তরে বলতে হয়, মানুষ যখন স্ত্রী-পশু এবং নারীর দেহরসকে গুরুত্ব দিতে শিখেছে তখন তার আদিম বিশ্বাসে ধারণা হয়েছিল পুরুষেরও বোধহয় ঋতুস্রাব হয় বা হওয়া স্বাভাবিক। বানারো জাতির লোকেরা পুরুষাঙ্গের 'ইউরেথ্রা' কেটে রক্তপাত ঘটিয়ে প্রমাণ করতে চায় পুরুষের ঋতুস্রাবের অস্তিত্ব।[১১৬]

আবিসিনিয়ার একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষাঙ্গ সংস্কারের রীতি দেখা যায়। আরও উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে এরা কুমারীপূজা করে। কুমারীকে এরা ভূলোক এবং দ্যুলোকের রানী বলে অভিহিত করে। একেই আবার তারা দেবতা এবং মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী বলে চিন্তা করে।[১০৭] (ভারতে বেদেদের

১১৫. Sex and Sex Worship, Ibid. P 225
In Rome sacrifices were offered to various deities, male animals to gods and female animals to goddesses

১১৬. SDFM & L. Vol 2 P. 706

১১৭ Sex and Sex Worship, Ibid p 329
Abyssinia contains several tribes, but the majority are Caucasians, although of very dark conplexion [ ] the circumcise their boys, [ ] they worship many saints and especially they worship the virgin whom they call the Queen of the Heaven and the Earth, and whom they consider the mediator between themselves and god

নাগিনীকন্যার ভূমিকাও একই)। এমনকি, কেবলমাত্র পুরুষাঙ্গের অংশবিশেষ অথবা তার চর্মচ্ছেদনের সুপ্রাচীন রীতিটি নয়, তার রক্তকেই ঋতুরজ ভ্রমে পানের প্রথা সেদিন পর্যন্তও ছিল।[১১৮]

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা হচ্ছে যে পুরুষের ঋতুচিন্তা যেমন মানুষের মনে ছিল তেমনি হাত এবং হাতের আঙুলও যে এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তার উল্লেখ আগেই করেছি। ছিন্ন পুরুষাঙ্গের রক্তপান যেমন ধর্মীয় চিন্তার অঙ্গ, (নারীর দেহরসের মতনই) তেমনি একই চিন্তাজাত দেবতার উদ্দেশ্যে হস্তাঙ্গুলি ও তার শোণিত উৎসর্গ। বৌদ্ধকাহিনীতে যে অঙ্গুলিমাল দস্যুতে রূপান্তরিত হয়েছিল সেটাও তার গুরুর আদেশেই। সে যুগে দেবতা তথা গুরুরা, মনে হয়, সকলেই একই চিন্তার শিকার। এছাড়া, কালিকা তন্ত্রোক্ত-দেবী; তার কটিদেশে যে অঙ্গুলিশাখ হস্তমালা তা-ও এই একই চিন্তার ফসল। এ কথা আগেই বলেছি, বিমলানন্দস্বামীর ব্যাখ্যার বক্তব্য রেখে।

শুনতে ভাবতে বা আলোচনা করতে সমস্ত দেহমন যতই কুণ্ঠিত হয়ে উঠুক না কেন একথা অতি সত্য যে এগুলি ছিল মানবসভ্যতার একটি বিশেষ স্তরের ধর্মীয় চিন্তা তথা আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ। স্ত্রী-পশু বা নারীর প্রজনন-শোণিতই সন্তান-প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। রক্তসম্পর্কিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান-চিন্তার উৎসস্থল এটাই। অথচ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-চিন্তার এই উৎসকে বিস্মৃত হয়েছে তখন নারী অথবা পুরুষ যে-কোনো একজনের রক্তই দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং সেটা পান করলে ধর্মীয় সাধনা করা হয়—এই ধরণের ভ্রান্ত ধারণাই কি পূর্বোদ্ধৃত রুধিপানের চিন্তার উৎস নয়? এখনও যে-সব মন্দিরে পশুবলি প্রচলিত আছে সেখানে ভক্তজনকে দেখেছি বলির রক্ত দিয়ে নিজেদের ললাটে বিন্দু অথবা রেখা এঁকে দিতে। পুরুষ-পশু বা নরবলির পেছনেও একই ভ্রান্ত চিন্তা। (ভুলে গেলে চলবে না মূলে দেবপূজার উৎস ভীতি নয়, ক্রুদ্ধ দেবতার ক্রোধ প্রশমন বা অসন্তুষ্টি দূরীকরণের জন্য অথবা জীবসৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত হয়নি। এই পরিকল্পনার মূলে মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টি, পশুশাবক সৃষ্টি, মনুষ্য-

---

১১৮. Ibid. P. 221.
In olden times the priest had to take the penis he circumcised in his mouth and susk it, as a part of ritual. This was forbidden in the days of Nepoleon.

সন্তান সৃষ্টি। এবং এরই সঙ্গে সৃষ্টি রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা—যদিও পথ ভুল হয়েছিল পরবর্তীকালে, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভ্রান্ত ধারণার ফলে)।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রক্তের ভুলে যাওয়া অথচ প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করলাম। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন,—আদি দেবতারা অনেকেই তো হিংস্র পশু। তারা অন্য পশুর রক্তে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে বলেই, সেই হিংস্র পশু-দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য কণ্ঠচ্ছেদ-বলি প্রথার প্রবর্তন অথবা রক্তদানের রীতি তো প্রবর্তিত হয়ে থাকতে পারে? কারণ, প্রাচীন প্রায় সব সভ্যতাতেই বলি দেওয়া হয় পূর্ণ বা আংশিক কণ্ঠচ্ছেদ প্রথায়।

স্বীকার করি, প্রাচীন পূজা-পদ্ধতিতে কণ্ঠচ্ছেদ বলির প্রথা মানুষ শিখেছে তার প্রথম গৃহপালিত পশু কুকুর বা কুকুর-জাতীয় হিংস্র মাংসাশী প্রাণীর কাছ থেকে। হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, আক্রমণকারী কুকুর অন্য কুকুর বা প্রাণীকে পেছনের দিকের পায়ে অথবা জঙ্ঘায় কামড় দিয়ে মাটিতে ফেলে প্রথমেই শিকারের কণ্ঠনালীতে দাঁত বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে। সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে সেটিকে ছিন্ন করার। এই হত্যা-রীতি মাংসাশী ভিন্ন অন্য কোনো প্রাণীতে লক্ষিত হয় না। শৃঙ্গী-জাতীয় তৃণভোজী প্রাণী শিকারকে পর্যুদস্ত করে থাকে শিঙের আক্রমণে। ঘোড়া বা গাধা জাতীয় শৃঙ্গবিহীন প্রাণী পেছনের পা দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে বা আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা করে (যদিও সুবিধা পেলে যে কোনো জায়গায় কামড়েও দেয়)। হস্তী তার শুঁড় বা পা ব্যবহার করে

পূর্ব আলোচনায় উল্লিখিত কাহিনীগুলোর একটিতে মুগুর-পেটা করার, একটিতে কাষ্ঠমঞ্চ চাপা দেওয়ায়, একটিতে জলে ডুবিয়ে মারার (কুমীরের শিকার পদ্ধতি; কুমীর ও আদিম দেবতাদের অন্যতম), একটিতে টেনে-হিঁচড়ে মারার যে হত্যাপদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়, সবই মানুষ শিখেছে তার এককালের নিকটতম প্রতিবেশী বন্য-প্রাণীর আচার-আচরণ থেকে। এটা ধারণা করা হয়ত অযৌক্তিক হবে না যে, প্রথম গৃহপালিত প্রাণী কুকুরের উল্লিখিত আক্রমণ এবং হত্যাপদ্ধতি-ই মানুষকে বলির শুইয়ে কণ্ঠচ্ছেদ করার চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু মূল প্রশ্ন তা নয়। বলি যেভাবেই হোক, পূজায় বলির উদ্দেশ্য শোণিত-প্রাপ্তি। যদি শিকারীজীবনের খাদ্যপ্রাপ্তির চিন্তা থেকে দেবআরাধনায় বলির উদ্ভব হত, তবে প্রজননসংক্রান্ত প্রতীকগুলি সেখানে প্রাধান্য পেত না। ধ্বংস নয়—সৃষ্টি এবং সৃষ্টি রহস্যকে জানাই যেখানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্দেশ্য সেখানে যে ঋতুশোণিত এবং মৈথুন প্রাধান্য পাবে এটাই তো স্বাভাবিক। লক্ষ্যকে ভুলে যাবার ফলেই, ভুল ব্যাখ্যায় দেবপূজায় বলি আরোপিত।

দেবতারা পশুস্তর অতিক্রম করে মানবমূর্তিতে এলেন। কিন্তু ঐতিহ্য রয়ে গেল দেবতার পূজাঅর্ঘ্যে রক্ত চাই, সে রক্ত পশু অথবা মানুষের কণ্ঠরুধির—যাই হোক না কেন। অনেকেই হয়তো প্রশ্ন তুলবেন—এ চিন্তা কি ঠিক যে আদিম পশুবলি-ই বর্তমানে নরবলিতে রূপান্তরিত? অনেকের কাছে এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে, যেহেতু আদিম মানুষ ছিল হিংস্র-নরখাদক তাই দেবপূজায় আগে ছিল নরবলি, পরে পশুবলির প্রচলন। আধুনিককালেও তো দেখি নরবলি নিষিদ্ধ হওয়ায় পশুবলি বিকল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং এর প্রমাণ পৃথিবীর সবদেশেই ছড়িয়ে আছে।

এ ধরনের নানাবিধ চিন্তার জবাব প্রসঙ্গত আগেই দেবার চেষ্টা করেছি তাছাড়া একটি চলতি কথা আছে—'কাকের মাংস কাকে খায় না'। অর্থাৎ স্বগোত্রীয় জীবভক্ষণের রীতিই যদি প্রকৃতিতে একমাত্র রীতি হত তবে কোনো প্রাণীই পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারত না। তাই ইতর প্রাণীজগতে প্রসব-ক্ষুধাকাতর জননীকে অথবা প্রাণীবিশেষে পুরুষ-প্রাণীর নবজাত-শিশু ভক্ষণের প্রবণতা দেখা গেলেও (রুক্মাবতী অবদানে স্বীয় নবজাত-পত্র ভক্ষণের কথা আছে। সূত্র—রাজেন্দ্রলাল মিত্র: দি স্যানসক্রিট বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অব নেপাল। কলকাতা ১৮৮২। পৃঃ ৫৯), কাঁকড়া-জাতীয় প্রাণী অতি শৈশবে মাতৃদেহ ভক্ষণের সাহায্যে বেঁচে থাকলেও, বড় হলে এরা কিন্তু স্বগোত্র ভক্ষণকারী নয়। নরখাদক যে-সমস্ত জনগোষ্ঠী নিবিড় অরণ্যে অথবা দুর্গম অঞ্চলে আজও বেঁচে আছে, তারা কেউ-ই স্বগোত্র ভক্ষণ করে না। শোনা যায়, আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বৃদ্ধকে মেরে ফেলার অথবা দুর্ভিক্ষের সময়ে শিশুকে মেরে খেয়ে ফেলার আদিম রীতি হয়তো ছিল, কিন্তু সে রীতির উদ্ভব-তথ্য অনুসন্ধান করলে অন্যতর সংস্কারের সক্রিয়তা প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা বেশি। নিজেদের গোষ্ঠী, বংশ অথবা পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আদিমকাল থেকে অদ্যাবধি অব্দি মানুষ বিভিন্নভাবে সচেষ্ট। কোনোভাবেই এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। যেখানে আদিম মানুষের একমাত্র প্রার্থনা নিজের বংশ, গোষ্ঠী-বৃদ্ধি, সে কেন দেব-আরাধনায় নরবলি দিতে যাবে। রেড ইণ্ডিয়ানরা কুমারীবলি দিত দাসপরিবার থেকে কুমারী বেছে নিয়ে, আমাদের দেশেও কখনো চুরি, কখনো বা ক্রয় করাই ছিল প্রাচীন রীতি। এই বলি যখন ব্যাপকরূপ ধারণ করল তখন নিজের পুত্র অথবা কন্যা উৎসর্গের

উপমন্ত্রয়তে স হিংকারো জ্ঞ(া) পয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্ বামদেব্যসামং মিথুনে প্রোক্তম্। ২।১৩।১

অর্থাৎ, (পুরুষ) যখন স্ত্রীকে আহ্বান করে তাহা হিংকার, আর যখন (বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা) তাহাকে সন্তুষ্ট করে (বা জানায়) তাহা প্রস্তাব, যখন এক শয্যায় শয়ন করে তাহা উদ্গীথ, স্ত্রীর অভিমুখ হইয়া শয়ন করে তাহা প্রতিহার, মিথুনভাবে যে কালক্ষেপণ করে তাহা নিধন এবং উহার যে সমাপ্তি তাহাও নিধন। এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে (স্ত্রীপুরুষে) প্রতিষ্ঠিত। ২.১৩.১।

এখানে নিধন কিন্তু জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো নয়। ইংরাজীতে 'কিল' শব্দটি একইভাবে দ্বৈত অর্থবাহক। 'টু কিল এনি বডি' 'টু কিল টাইম', 'টু কিল ভার্জিনিটি'—এরা কখনোই একার্থক নয় এবং বাংলার অশ্লীল শব্দের সঙ্গে মার, উদ্ধৃত উপনিষদিক মন্ত্রে নিধন বা হত্যা এবং 'টু কিল ভার্জিনিটি'তে 'কিল' কথা সমার্থক। মূলত এই শব্দগুলো শিকার-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তখনই স্পষ্ট বলে জীবনান্ত এবং মিলন উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হত।* স্বভাবতই 'গোত্রহত্যা' শব্দটিতে 'হত্যা' শব্দের যে ব্যবহার তাতে জীবনান্তীকরণের কোনো অনুষঙ্গ নেই। কেদারনাথকে গোত্রহত্যা তথা আলিঙ্গনে মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকবার কথা। সে উদ্দেশ্য থাকলে অনুষ্ঠানটি-ই উঠে যেত পূজা-পদ্ধতি থেকে।

মনে রাখা দরকার কেদারনাথের বিগ্রহ কোনো মনুষ্যমূর্তি নয়। সেটা ত্রিকোণ আকৃতিবিশিষ্ট একটি যূপ মূর্তি। (ত্রিকোণাকৃতি হতে হলেই তা মূলত লম্বা ত্রিভুজাকৃতি হবে। শৈব এবং শাক্ত দর্শন অনুসারে ত্রিকোণ বা ত্রিভুজের আলোচনা পরবর্তী ১২৭ নং পাদটীকার বিষয়বস্তুতে আছে)। এই ধরণের দেবমূর্তির সঙ্গে আলিঙ্গন বা মিলন অর্থে 'হত্যা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়ে একটি ধর্মানুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে সূচিত করছে। অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন। কারণ, 'গোত্রহত্যা' অনুষ্ঠানের আচরণীয় দিকটি সম্বন্ধে একালের ভক্ত বা মন্দিরের পুরোহিত সচেতন থাকলেও এর তাৎপর্য বা নামের অর্থ সাধারণভাবে জ্ঞাত নয়। ভক্তরা যে জানেন না তা তো লেখকের উক্তিতেই স্বীকৃত এবং পুরোহিত যদি জানতেন তবে লেখক সেটা জেনে নিতে পারতেন। সেটাও সম্ভবত সম্ভব হয়নি।

* ঠিক এই জাতীয় আর একটি বাংলা ক্রিয়াপদ 'পাড়া'। পাখি ডিম পাড়ে আর শিকারীও ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সেই ডিম তার বাসা থেকে পাড়ে।

শিবপূজা মূলত কুমারী-কন্যাদের পূজা। লৌকিক শিবপূজায় কুমারীদের প্রার্থনা 'শিবের মত বর চাই'। এই চাওয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি 'কুমারসম্ভব কাব্যে' উমার তপস্যায়। সেখানে কামদেবের ভূমিকা দেহমিলন-চিন্তার ঊর্ধ্বে নয়। মদনভস্মের পরিকল্পনায়, পূর্বোক্ত চিন্তাই যে একমাত্র নয়—এই দার্শনিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। তথাপি 'কুমারসম্ভব'-এ বিবাহের পর হর-পার্বতীর মিলনচিত্রে কিন্তু কোনো দার্শনিকতা নেই। মদনের ভস্মের প্রয়োজন, তাই সেখানে জীবনের অতিবাস্তব সদ্ভাব প্রকাশ ঘটেছে।

যা হোক, 'হত্যা' শব্দটি যে বিশেষ অর্থানুষঙ্গে প্রজনন সংক্রান্ত ক্রিয়াপদ হিসাবে হামেশাই ব্যবহৃত হয় সেটা ইংরাজি, বাংলা, সংস্কৃত সব ভাষা থেকেই দেখা গেল। এবার 'গোত্র' শব্দটির বিশ্লেষণ করা যাক। এই প্রসঙ্গে বৈদিক গণ সম্পর্কে জনৈক আলোচকের আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

> গোত্র জিনিসটি গোলমেলে। গোত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ ছিল গো-শালা বা গো-নিবাস এবং পরবর্তী অর্থ হচ্ছে বংশ বা কুল। বাজসনেয়ী সংহিতার ব্যাখ্যাকার উবট ও মহীধর এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন (শুক্ল যজুঃ ৭।৪৮, ৩৯)।
>
> গোত্র শব্দের কুল অর্থ স্বীকৃত হয়েছে অমরকোষে (নামলিঙ্গানুশাসন বা।— ক্ষীরস্বামীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। গোত্র জনন কুল অন্বয়, সন্তান একার্থবাচক, জনশ্রুতি অনুসারে।
>
> স্কন্দপুরাণে কয়েকজন গোত্রদেবীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেকগুলি নাম দুর্গাদেবীর নামের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।
>
> গোত্রদেবীদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, মাতঙ্গী, মাহেশী ইত্যাদি। দেবীপুরাণ অনুসারে দুর্গাও এই সকল নামের দ্বারা ভূষিতা [স্কন্দ, ব্রহ্মখণ্ডের ধর্মারণ্য খণ্ড, ১।১০ ..., ...। ও দেবীপুরাণ ১৬, ১৭, ৩৭ অধ্যায়]।
>
> অধিকাংশ গোত্রদেবীই বোধ হয় গ্রামদেবী ও লৌকিক ধর্মে আশ্রিতা। আক্ষরিক অর্থে গোত্রদেবী গোত্রকে রক্ষা করেন, গোত্রের উপর কর্তৃত্ব করেন। [ ] আর্যীকরণের প্রয়োজনে স্থানীয় বা লৌকিক দেবীরা আর্য গোত্র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।[১২৫]

১২৫ বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। ঐ।

'গোত্র' শব্দটি যে বড গোলমেলে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয়। আরও গোলমেলে উবট এবং মহীধরভাষ্য। 'গোত্র' শব্দটি বৈদিক আর্যদের শব্দ; ঋক্ সূক্তে ব্যবহৃত। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, গো-শালা বা গো-নিবাস শব্দ দুটি বললেই এমন এক স্থিতিশীল বাসস্থান বোঝা যায় যেখানে মানুষের নিজের বাসস্থান বা গৃহ, দেবালয়, রন্ধনশালা, অতিথিশালা ইত্যাদি পৃথক পৃথক গৃহ বা শালার মতনই গো বা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর আশ্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে বা ছিল। এ চিত্র তো স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থার। কিন্তু আর্যরা (ভাষা-গোষ্ঠীর) ঋক্সূক্ত রচনা করেছিল যে সময়ে, তখন কি তারা স্থিতিশীল? তারা তো এক বর্বর এবং যাযাবর জীবনযাপন করছে পশুচর্মের তাঁবুতে। তাদের গৃহস্থালীর আসবাবপত্র পরিধেয় সবই মূলত পশুচর্মজাত। এই যাদের গার্হস্থ্য তথা সামাজিক তথা গোষ্ঠীজীবনের চিত্র, তারা কি তখন অর্থাৎ সেই সুপ্রাচীন যুগে গৃহপালিত পশুর জন্যও কোনো আলাদা তাঁবু ব্যবহার করতো যাকে গোশালা বলা যায়, না সেটা সম্ভব ছিল? এবং যদি না হয়, তারা যদি সে-ধরণের কোনো তাঁবু না করে থাকে তবে 'গোত্র' শব্দটি প্রাথমিক স্তরে ঐ অর্থে কেমন করে তাদের ভাষায় ব্যবহৃত হত বোঝা মুস্কিল। অথচ, উবট-মহীধর একরকম ব্যাখ্যাই করেছে। গোশালা ভিন্ন করে তাদের তাঁবুতে না থাকলেও 'গোত্র' শব্দটি তখন ঐ ভাষায় ব্যবহৃত হত এবং তার অর্থ আর্য (বৈদিক) ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেরা বুঝতো,—এটাকে যদি স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় তবে 'গোত্র' অর্থে তারা কি বুঝতো? দ্বিতীয়ত, শব্দটি যে আর্যভাষা-গোষ্ঠীর লোকেদের, একথা বৈদিক-সমাজবিদ্ স্বীকার করেছেন ('আর্য গোত্র-নামের'), স্বীকৃতি দিয়েছেন সমস্ত টীকাকার বা অভিধানকাররাও। তা ছাড়া এই শব্দটি অন্য কোনো ভাষায় আছে কিনা, বর্তমান লেখকের তা জানা নেই। শব্দটির পরবর্তী অর্থ, বলা হয়েছে জনন, কুল, অন্বয়, সন্ততি—জনশ্রুতি অনুসারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে-'জন', যাদের শ্রুতিতে গোত্র অর্থ জনন—তারা কারা? আর্যেতর-ভাষা জনগোষ্ঠীর লোক তারা নিশ্চয়ই নয়, সেই আর্যভাষাভাষী-গোষ্ঠীর বসতির প্রথম যুগে। এ-জন' বৈদিক আর্য-ভাষাগোষ্ঠীর জন। এদেরই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় 'গোত্র' জনন এবং সন্ততি অর্থে ব্যবহৃত হত, গোশালা অর্থে নয়। গোত্রের প্রাথমিক অর্থ যদি গোশালা-ই হবে (হওয়া সম্ভব নয়, কেন নয় তা-ও একটু আগে বলবার চেষ্টা করেছি), তবে সেই প্রচলিত অর্থ আর্যগোষ্ঠীর ভাষা থেকে বেমালুম উবে গেল কেন? কেন আর ঐ অর্থে শব্দটির ব্যবহার হল না? আর কেনই বা পরবর্তী অর্থগুলিতে ব্যাপকভাবে

ব্যবহৃত হতে থাকল? যদি বলি, প্রথমাবধিই শব্দটি 'জনন' অর্থে ঋক্‌সূক্তে-৫ ছিল, পরবর্তীকালের ব্যাখ্যা-কর্তারা 'গোশালা' অর্থে ব্যাখ্যা করেও সে যুগের মানুষের কাছে সেই ব্যাখ্যা টিকিয়ে রাখতে পারেননি বলে তার প্রাথমিক অর্থেই বরাবর প্রযুক্ত হচ্ছে, তাদের ব্যাখ্যা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি—তবে কি ভুল চিন্তা করা হবে? মনে হয় এবং বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস 'গোত্র' শব্দের প্রাথমিক অর্থ ছিল জনন ও সন্ততিসংক্রান্ত, এবং ব্যাখ্যার অর্থ গোশালা, যেটা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এই দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে রয়েছে জনশক্তির অর্থের প্রবল প্রবাহবেগ সে যুগের আর্য ভাষাভাষীদের জীবনযাত্রার চিত্র এবং বর্তমান প্রসঙ্গে (গোত্র-হত্যা) 'হত্যা' শব্দটির অর্থানুষঙ্গ। আসলে লৌকিক শব্দই তো পরিশীলিত হয়ে সাহিত্যের ভাষায় স্থান পায়।

এবার শব্দটির বৈদিক ব্যবহার দেখা যাক: ৮।৫।১০ ঋক্‌সূক্তে শব্দটি এককভাবে ব্যবহৃত। ২।২৩।৩, ৬।১৭।২, ১০।১০৩।৬ ঋক্‌সূক্তে এবং ২০।২৮ বাজসনেয় সংহিতার মন্ত্রে বৃহস্পতি এবং ইন্দ্রের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এঁরা গোত্রভিদ।[১২৬]

কিন্তু, বৈদিক ত্রিকোণাকৃতি রথকে জানতে হলে আমাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় যাওয়া দরকার।

শৈব এবং শাক্ত দর্শন অনুসারে সৃষ্টির উৎস 'বিন্দু' সৃজনমুহূর্তে ত্রিকোণাকৃতি ধারণ করে। এই ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর নাম—অগ্নি, সূর্য এবং চন্দ্র। এরা যথাক্রমে তিন দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র। ত্রিভুজের তিন বাহু তিন দেবতার তিন শক্তি—বামা, জ্যেষ্ঠা আর রৌদ্রী।

প্রথম ত্রিভুজের নাম শিবত্রিভুজ। এর শীর্ষবিন্দু নিম্নমুখী। ঊর্ধ্বশীর্ষবিন্দু ত্রিভুজ—'শক্তি'তে প্রথম ত্রিভুজ অর্থাৎ শিবত্রিভুজ থেকে সৃষ্টিবীজ ক্ষরিত হয়। এই হচ্ছে অশ্বিদ্বয়চালিত রথ।[১২৭]

১২৬ A Sanskrit English Dictionary p. 361-2

১২৭. Rajmohan Nath : Rig-Veda Summary Shillong, 1966. p 23-24

Triangular Chariot : According to the Shaiva and Shakta philosophy, the vindu (point) from which the creation originates while disseminating its energy assumes the form of a triangle. The three apex points are named respectively—Agni, Surya and Chandra ; as gods they are respectively Brahma Vishnu and Rudra. Radiating dynamism in the three arms are females, the consorts of the three gods, named respectively as Vama, Jyestha and Roudri.

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির পর বৈদিক রথের প্রকৃত তাৎপর্য (শৈব ও শাক্তদর্শনের আলোতে) আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইন্দ্র বা বিষ্ণুর রথ কেমন করে গোত্রভেদ করে, তা বুঝিয়ে না বললেও চলে। ইন্দ্র-বিষ্ণু গোত্রভিদ্‌; কেদারনাথের আলিঙ্গন অনুষ্ঠানের নাম গোত্রহত্যা। উপাসনার শেষ অনুষ্ঠান আলিঙ্গন। এই 'আলিঙ্গন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ আশ্লেষ বা পরিষঙ্গ। ব্যুৎপত্তি—আ—লিগ্‌, ধাতু। অর্থাৎ দেবতার সঙ্গে আশ্লেষ বা মিলন। পুরুষাঙ্গ-মূর্তি দেবতার সঙ্গে আলিঙ্গনের নাম গোত্রহত্যা। 'গোত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি—গো-ত্রৈ ধাতু। গো শব্দের অন্যতম অর্থ যাস্ক তাঁর নিরুক্ততে করেছেন, 'জল'। ত্রৈ-ধাতুর অন্যতম অর্থ 'লেগে থাকা'।[১২৮] বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৬.৪.২ সংখ্যক মন্ত্রে জলকে সৃষ্টিবীজ বলা হয়েছে। এই সৃষ্টি বীজধারণ করে যা তা-ই গোত্র। শৈব এবং শাক্তচিন্তায় এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত ত্রিকোণাকৃতি রথ-প্রসঙ্গে। বস্তুত ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, শৈব-শাক্তের চিন্তায়, লোকোক্তির বক্তব্যই গোত্র প্রসঙ্গে স্বাভাবিক এবং সহজ বলে মনে হয়। এছাড়া, তন্ত্র-অনুসারে কুলাগার শব্দের অর্থ যোনি।

তাহলে বলা যায়, প্রাক্‌বিবাহিত জীবনে অনুগ্রহ লাভের কামনায় দেবতার সঙ্গে মিলনই গোত্রহত্যা; আর এটি বা এই আলিঙ্গন ছিল কুমারীর আচরণীয় অনুষ্ঠান। শৈব-শাক্ত সাধনতন্ত্রে কেমন করে গৌরীত্বে উন্নীত করা হয় তা দেখেছি আমাদের উদ্ধৃত 'গৌরীগরণ' অনুষ্ঠানে। সেখানে ভৈরবের পুরুষাঙ্গকে সোজাসুজি 'শিব-প্রতীক' বলা হয়েছে। এবার বোধহয় আমরা বলতে পারি যে জনশ্রুতিতে 'গোত্র' শব্দটি জনন এবং সন্ততি অর্থে এসেছে এই সূত্র ধরে। আর এই জাতীয় অনুষ্ঠান বহু প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর অনেক দেশে বিভিন্ন জন-গোষ্ঠীতে চলে আসছিল।

পশু-দেবতার প্রসাদ আদিম ধর্মচিন্তায় বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠানে অথবা সন্তান কামনায়

The first and the initial triangle has its apex downwards, as it is an energy-pouring device, [...] this is the positive aspect and is known as Shiva triangle. Out of this through its downward apex point (vindu) the energy is discharged forth downwards in the form of a reverse triangle [...] This is the Shakti triangle. This latter triangle is the triangle of force that effects the physical creation of the universe. This is the chariot of the Asvins with one wheel resting on a firm and indestructible hill-top, i e . . the apex of the downward triangle.

১২৮. A Sanskrit English Dictionary ত্রৈ : to cherish—to cling to (A Concise English Dictionary.)

কেমন করে লাভ করত তা দেখেছি আসীরীয়, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায়, নিলো-পোলিস-মেমফিস, মেণ্ডেসের ষণ্ড বা ছাগ দেবতার আলোচনা প্রসঙ্গে, অশ্বমেধের অশ্বে, গান্ধারীর বৈধব্য দূরীকরণে ছাগ-বিবাহ অনুষ্ঠানে, ক্ষীণ আভাস সোনাবাড়ের কাহিনীতে। মেমফিসের এই ষণ্ড দেবতার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন সেখানকার কৌমার্য-ভঙ্গের দেবতা 'ফ্‌তা'। উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গ 'ফ্‌তা' যুগ্মপদে (মনে হয় একপাদ) সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে তাঁর একটি দণ্ড। জীবনের প্রতীক 'অঙ্খ' স্থিতির প্রতীক 'টেট' এবং অপার্থিব 'উয়স্' দিয়ে দণ্ডটি তৈরি।[১২৯] শকুন-প্রতীক মিশরীয় দেবী 'মুবেন'-এর প্রতীকিত যুগনদ্ধ মূর্তিটিও 'ফ্‌তা'-এর সঙ্গে পাওয়া গেছে।[১৩০] অন্যদিকে আবার প্রাচীন রোমের উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গ কৌমার্যভঙ্গের দেবতা ছিলেন 'প্রিয়াপাস'। রোমান মহিলারা উদ্ধতরূপে উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গের সঙ্গে মিলিত হতেন (ভারতীয় চিন্তায় শিবোপাসনা একই কামনা নিয়ে)। আফ্রোদিতের এই পুত্রটি ল্যাম্পাস্‌কাস্ থেকে রোমে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি অন্য একটি লিঙ্গদেবতা 'মিউটিনাস'-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যান।[১৩১] আলিঙ্গন এবং মিলন এখানে পূজা-বৈশিষ্ট্য। বিয়ের কনেকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের আগে (কখনও নারী-পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে যেত, কখনও বা সে নিজেই গিয়ে অথবা বিয়ের পর স্বামী এবং বরযাত্রীদের নিয়ে) প্রিয়াপাসের উচ্ছ্রিত সাধনদণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবতাকে নিজের কুমারীত্ব উৎসর্গ করত।[১৩২]

বিবাহের পূর্বে বা পরে শিব-মন্দিরে পূজার রীতি আজও আমাদের দেশে

১২৯. SDFM & L • Vol. 2. p 908

১৩০. Sex and Sex Worship. Ibid p 532

১৩১. SDFM & L : Vol 2. p. 886.

Priapus [...] a faunlike creature with a noble erect penis He ensured the fertility of gardens, crops, animals, women A son of Aphrodite, he was a late importation into Rome from Lampuscus where [ ] he was supreme among all gods. In Rome he became identified with Mutinus, another sexual deity [ ] Roman women embraced him and had sexual orgies on his permanently erect member [ ]

১৩২. Sex and Sex Worship. Ibid. 531.

Among the Romans, the bride was taken to the temple of Priapus, either before the ceremony by the priestesses alone, or more usually, after the ceremony, accompanied by the husband and wedding party, where she had connection with the god, to whom she thus offered up her virginity.

প্রচলিত। অন্যান্য আলোচিত দেশের ফ্‌তা, প্রিয়াপাস, মিউটিনাস-এর মত দেবমূর্তির সঙ্গে আলিঙ্গন এবং কৌমার্য-নিবেদনের মত অনুষ্ঠান আমাদের দেশের দেবমূর্তির সঙ্গে হত। কেদারনাথের গোত্রহত্যায় এবং অন্যান্য লিঙ্গদেবতার মন্দিরে দেবমূর্তির সর্বাঙ্গে ঘৃত বিলেপন বা আলিঙ্গনের মত রীতি প্রচলিত থাকায় মনে হয় আলোচিত দেশগুলোর মত পূর্বোক্ত প্রথা আমাদের দেশেও প্রচলিত ছিল সুদূর অতীতে।

কেবল সুদূর নয়, নিকট অতীতেও সে ছিল তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যে।—

ছত্রিশগড়ের অন্যতম জেলাশহর বিলাসপুর। বিলাসপুর স্টেশন থেকে বাসে ১৬ কিলোমিটার দূরে ভৈরোবাবার মন্দির অবস্থিত। ভৈরব থেকে ভৈরো হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গে মূল মন্দিরের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। জায়গাটা নির্জন, চারিপাশে জঙ্গল। মন্দির সংলগ্ন বিশ্রামাগার আছে। আছে একটা পুষ্করিণী। আনুমানিক ৩৫০ বছরের অধিক পুরানো হবে মন্দিরটি।

কিংবদন্তী আছে যে নতুন বর কনেকে এই পথ দিয়ে নিয়ে যাবার সময় কনেকে বাবার কাছে একরাত্রি যাপন করার জন্য রাখতে হতো। এই প্রথা চলে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ একবার কোন নরসুন্দরের কন্যার বিয়ের সময় এর ব্যতিক্রম ঘটে। নরসুন্দর ছুরির আঘাতে বাবার পুরুষাঙ্গ ছেদন করেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার জলজ্যান্ত মানুষটি তৎক্ষণাৎ পাথরে পরিণত হন বলে জনশ্রুতি। সেই বাবাই ভৈরোবাবা নামে খ্যাত। মন্দিরটি ছোট। প্রমাণ মাপের পাথরের ভৈরোবাবা দণ্ডায়মান, লাল শালুর কাপড় জড়ানো রয়েছে তার কটিদেশে।

'ভৈরোবাবা' শিরোনামে শ্রীনারায়ণ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'ইতিহাসে জানা যায় হৈহয় বংশীয় রাজারা ১৭৪৫ সাল পর্যন্ত সুনামের সঙ্গে রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজা রতনদেব তুম্মান থেকে রতনপুরে রাজধানী নিয়ে আসেন। ...রতনপুরের হৈহয় রাজারা আত্মকলহে লিপ্ত হন এবং এই সুযোগে ১৭৫০ সালে মারাঠারা রতনপুর অধিকার করেন। এই সময় চারিদিকে অরাজকতা শুরু হয়।...আশেপাশে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। ঠ্যাঙারে, গুণ্ডা, ডাকাতের অত্যাচার ছিল বলে শোনা যায়। এই সময় অনেক উপাসক থাকতেন এই জঙ্গলে'।*

* যুগান্তর ১০. ৮. ৮৩, পৃ. ৪/৩—৪

বর্তমানের কর্তিত-পুরুষাঙ্গ, রক্তাম্বর কটিদেশ ভৈরোবাবা কিংবদন্তী অনুসারে মূলে ছিলেন এমনি একজন উপাসক।

কিংবদন্তী মূল ঘটনার দুটি দিককে একত্রিত করে ফেলে উপাসককে ভৈরোবাবায় রূপান্তরিত করেছে। মূলে 'ভৈরব'-উপাসক কেউ হয়তো এইমূর্তি ও মন্দিরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন; যার কাজ ছিল দেবমূর্তির উচ্ছ্রিত-পুরুষাঙ্গের সঙ্গে নববিবাহিত বালিকাকে, ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী মিলিত হতে বাধ্য করা।

প্রস্তর নির্মিত পুরুষাঙ্গের সঙ্গে বালিকার মিলন প্রচেষ্টা হয়তো এমন প্রাণ সংশয়কারী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, যে দৃশ্য দেখতে না পেরে; স্নেহের পুত্তলী অবোধ বালিকা-কন্যার যন্ত্রণায় ব্যথাতুর হয়ে, মূর্তির পুরুষাঙ্গ ছেদন করে প্রথারই মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছেন কোনো পিতা। এবং যে পুরোহিত এই প্রথার ধারক ছিলেন তারও পুরুষাঙ্গ ছেদন করেছিলেন (কারণ, এমনও হতে পারে যে দেবমূর্তির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক মিলনের পর ভৈরোবাবা নামীয় পুরোহিত, ঐ অঞ্চলের অধিবাসী, ঐ ধর্মীয় সংস্কারে সে যুগে বিশ্বাসীদের প্রতিটি নববিবাহিতা কন্যার কৌমার্য হরণ করতেন)।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতও এই প্রাচীন অমানবিক ধর্মীয় সংস্কারের বশে এই মূর্তি গড়েছে। আর এই তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মূর্তি এবং তৎ-কেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের ধর্মীয় পরিশীলন প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে পুরুষাঙ্গধর পুরুষদেবমূর্তি, যাতে দেখানো হয়েছে, দেবীরা মিলিত হতে আসছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলবার তাগিদ অনুভব করছি। মানুষের মনের মাধুরী মিশিয়েই দেবমূর্তি এবং অনুষ্ঠানগুলোর সৃষ্টি। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তার স্বীকৃতি না থাকলে কোনো দেবমূর্তি বা তার আরাধনা-সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং বিধিনিষেধ গড়ে উঠতে পারে না। পুরোহিত গুরু বা ভৈরব 'গৌরীগরণ' অনুষ্ঠানে গোত্রহত্যা করেন, এটা সামাজিক রীতি বলে এককালে বহুল পরিমাণে স্বীকৃত ছিল। এই সামাজিক রীতিকে ধর্মীয় রূপ দেবার জন্যই প্রয়োজনীয় দেবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। তাই যে কাজ ভৈরব বা অন্যান্যরা করেন সেটা দেবমূর্তির সঙ্গে হওয়ার বাধা যে অন্তত সে যুগে ছিল না, তার উদাহরণ ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে দেবার চেষ্টা করেছি।

তবুও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। পুরোহিতশ্রেণী দেবতারই দাস। এটাই তো ভক্তজনের বিশ্বাস। কিন্তু সত্যিই কি দেবতার আদেশ পুরোহিতরা পালন করেন, নাকি তাঁরা যে ধ্যানধারণগুলি পোষণ করেন সেইগুলিকেই দেবতারা নির্দেশ বলে প্রয়োগ করতে চান? এর স্পষ্ট উত্তর বোধহয় মিলবে 'বিসর্জন'

নাটকে রঘুপতির আচরণে। পুরোহিতের ইচ্ছাতেই দেবীকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে হয়, রঘুপতির কণ্ঠে কথা বলতে হয়, এমনকি নদীগর্ভে আত্মবিসর্জনও করতে হয়। অন্যদিকে রাজা গোবিন্দমানিক্যও দেবীর ভক্ত; তাঁরই ইচ্ছাতে বহুদিনের প্রথা জীববলি বন্ধ হয়ে যায়। আবার দেবীকে ভক্ত জয়সিংহের উষ্ণ বক্ষরক্ত পান করতে হয়। সবক্ষেত্রেই কিন্তু দেবী নির্বিকার।

একই ঘটনার পুনঃসংঘটন দেখি বিভিন্ন মন্দিরে। যে মন্দির একসময় নররক্তে অভিসিঞ্চিত হত, তাকে আজ পশুরুধিরে তৃপ্ত থাকতে হয়। যে দেবী পশুরক্ত পানে একসময় তৃষ্ণানিবারণ করতেন, তাঁকে আজ আদা-মধু-মাষকলাই নিবেদন করেন ভক্তরা। সবক্ষেত্রেই দেবতা নির্বিকল্প সমাধিস্থ থাকেন। দেখে-শুনে, 'যে যথা মাং প্রাপদ্যন্তে'—এই মহাবাণীকেই স্মরণ করতে ইচ্ছা করে।

যে কথা বলছিলাম, কৌমার্যহরণের অনুষ্ঠান যে ভৈরবগণ করতেন—সেটা দেখেছি। তান্ত্রিক-দেবীদের সঙ্গে শিবের মিথুনাবস্থার মূর্তি (ফ্‌তা এর সঙ্গে 'স্নবেন'-এর যুগনদ্ধমূর্তিতে 'স্নবেন' শকুনরূপিনী) আমাদের দেশেও আছে।

> নীলতারা বজ্রতারা প্রভৃতি নামে পরিচিত কালিকা মূর্তিগুলি আশা করি সকলেই দেখেছেন। নীলতারা পরিকল্পনায় উলঙ্গিনী-কালিকা শিবের উরুদ্বয়ে নতজানু ভঙ্গীতে বসে আছেন। সেই আলুলকুন্তলা, মিথুনাসনা মূর্তিই হোলো আদিমতম কালিকা-মূর্তি।[১৩৩]

প্রায় সদৃশ তারামূর্তি দেখেছি বুদ্ধগয়ায়, নালন্দা সংগ্রহালয়ে। 'তারা' নামটি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত। মিশরের 'ফ্‌তা'-এর মত উচ্ছ্রিত পুরুষাঙ্গধর ব্রহ্মার মূর্তিও এদেশে আছে। একটি মূর্তিতে,

> অর্ধবিকশিত শতদলের ভেতর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চতুরানন দুই হাতে উচ্ছ্রিত-সাধন ধারণ করে আছেন। আর একটিতে যোগাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মার দিকে মুখ করে, আলুলায়িতকুন্তলা এক তরুণী তাঁর দুই জানুতে পা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন। [...] শবরূপী শিব এক হাতে কালিকার কটি বেষ্টন করে অন্য হাতে স্বীয় সাধন ধরে আছেন। [...] বিষ্ণু বা নারায়ণের ক্রোড়ে দক্ষিণমুখী হয়ে উপবিষ্টা লক্ষ্মী একপদ উন্নীত করে রয়েছেন এবং দক্ষিণ হস্তে নায়ক তার বসনাঞ্চল আলুলায়িত করছেন, এ রকম যুগলমূর্তি যথেষ্ট আছে। শঙ্খ-চক্রধারী বিষ্ণুর

---

১৩৩. সমাজসমীক্ষা : অপরাধ ও অনাচার। ঐ। পৃঃ ৩।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, নূপুরাঙ্কিত চরণে নৃত্য করতে করতে লক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বা গজানন গণপতি উচ্ছ্রিত সাধনদণ্ড বামহস্তে ধারণ করে ও দক্ষিণ-হস্তে মুদ্রা রচনা করে নৃত্য করেছেন, এরকম মূর্তি দাক্ষিণাত্যে আশা করি অনেকেই দেখে থাকবেন। [···] কষ্টিপাথরের তৈরী এক বিশালকায় গৌরী-পট্টের গহ্বরে পা রেখে শিব তাণ্ডবনৃত্য করছেন, আর যোনিপথের প্রলম্বিত অগ্রভাগ দিয়ে নরমুণ্ডরূপী জীব-প্রবাহ অজস্র ধারায় স্খলিত হয়ে আসছে, এরকম একটা মূর্তির প্রতিলিপি সম্প্রতি দেখলাম।[১৩৪]

ব্রহ্মার অথবা শিবের, গজাননের পুরুষাঙ্গধর এই মূর্তি ভক্তরা কি কাজে ব্যবহার করতেন? পরিকল্পনার প্রথমস্তরে তাঁর উপাসনারীতি কি ফ্‌তা, প্রিয়াপাস অথবা মিউটিমাসের মতই ছিল?

এইসব মূর্তি দেখলে, 'গৌরীগরণ' অনুষ্ঠানের কথা শুনলে উদ্ধৃত ভৈরোবাবার মূর্তি ও কিংবদন্তীকে অস্বীকার করা যায় না। এই গোত্রহত্যা বা কৌমার্যহরণের অনুভূতির একটি সুন্দর কাব্যরূপ দেখি 'কবীন্দ্র-বচনসমুচ্চয়'-এর শিলা ভট্টারিকার লেখা একটি কবিতায়। প্রাসঙ্গিক হবে জেনেই সেটির উল্লেখ করছি।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা—
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসী বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥[১৩৫]

কৌমার্যহরণের অনুষ্ঠান যে কত রোমাঞ্চকর ছিল এই কবিতাটি তার প্রমাণ। কবিতার প্রথম চরণে 'যিনি আমার কৌমার্যহরণ করেছেন তিনিই আমার পতি' এই উক্তিটি থেকেই প্রমাণিত যে গোত্রহত্যাকারী সর্বদা বধূর পতি হবেন এমন নিয়ম তখন ছিল না। ছিল না, তার প্রমাণ গৌরীগরণ অনুষ্ঠান। আর এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে 'গুরুপ্রসাদী' রীতির কথা অথবা ছত্রিশগড়ের ভৈরোবাবার কাহিনীকে।

গোত্রহত্যায় দেবতার সঙ্গে আলিঙ্গন ধর্মীয় অনুষ্ঠান। গৌরীগরণে ভৈরব

১৩৪. ঐ। পৃঃ ৩,৭।

১৩৫. বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত: সাহিত্য-দর্পণ। কলকাতা ১৮৭৫ শকাব্দ। পৃঃ ১৪।

তাঁর শিবপ্রতীক দিয়ে কুমারীত্বভঞ্জন করেন সাধনপন্থায়। আবার, বিবাহ অনুষ্ঠানে আরাধ্যদেবতার প্রতিভূ হিসাবে বিবাহ-সম্পাদনকারী পুরোহিতের পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার (পতির পূর্বেই) নববধূর কুমারীত্ব-হরণের; ইচ্ছা করলে সে তিন রাত্রিও বধূকে ভোগ করতে পারত।[১৩৩] অর্থাৎ বিবাহেচ্ছুক কুমারী দেবতাকে উৎসর্গ করতে হবে তার প্রথম যৌবনের প্রথম ফসল কুমারীত্বকে। এই চিন্তাধারারই প্রতিফলন শিবদেবতার মূর্তিতে ঘৃতবিলেপন, আলিঙ্গন এবং চুম্বনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গোত্রহত্যা অনুষ্ঠানে, 'ভোগ' রাগ কাহিনীতে। চিন্তাটি অমূলক নয়।

অন্যান্য দেশের মত গোত্রহত্যার বহুপর্ব ভারতের দেশেও প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত উক্তি এবং 'গোপন' থেকে এই সিদ্ধান্ত-ই আসতে হয়। 'গোত্র হত্যা' 'গোত্র' অথবা 'গোত্রহত্যা'র আলোচনা এইজন্যই করতে হোল যে, প্রথম স্তরে ছিল গোত্রহত্যা অর্থাৎ কুমারীত্বের হত্যা—উদ্দেশ্য, আরাধ্যদেবতার কাছে নিজেকে নিবেদন করে ভবিষ্যতের সুখী দাম্পত্য-জীবনের জন্য, সুস্থসবল সন্তানলাভের কামনায় আশীর্বাদ প্রার্থনা—মানুষের ধর্মচেতনা। ভুল ব্যাখ্যায় তা-ই হয়ে দাঁড়াল কুমারীবলি অর্থাৎ কুমারীর কণ্ঠচ্ছেদন, অন্য অর্থে প্রাণহরণ। ভুল ব্যাখ্যার ফলে, কি এ দেশের, কি বিদেশের আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় চিন্তায় কুমারীর প্রাণহরণের সঙ্গে যুক্ত হল হত্যা-পূর্ব মৈথুন অনুষ্ঠান। কখনো এই দ্বিমুখী-ভুল চিন্তার ফলশ্রুতিতে কুমারীর কুমারীত্বকে হত্যা করে সাধক ভাবলেন তাঁর সাধনা হল, কখনও তাকে হত্যা করে দেবীকে তুষ্ট করবার পথ খুঁজলেন সাধক। অন্যদিকে, প্রজননের অমোঘ সংকেত ঋতু-রজ তথা দেহরসকে ভুলে গিয়ে দেবদেবী বেতাল জল বা বৃক্ষদেবতার সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করা হতে থাকল ছিন্নকণ্ঠ কুমারীর কবন্ধরুধির। আর সেটাকেই, সেই অপ ব্যাখ্যার আচরণকেই দেবায়িত করে কল্পিত হল অন্যতম তান্ত্রিক-দেবী, দশমহাবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা—ছিন্নমস্তার মূর্তি (যদিও মূল উদ্দেশ্যটি প্রতীকিত হয়ে পদতলে

১৩৩. H. Risley : The people of India. Delhi 1969. p. 209

When the Zomorin marries, he must not cohabit with his bride till the Nambourie, or chief priest has enjoyed her, and if he pleases, may have three nights of her company, because the first fruits of her nupitals must be an holy oblation to the god she worships.

বিরাজ করতে লাগল। অবশ্য, এক সময়ের পশুমাংসরূপ খাদ্যপ্রাপ্তি, তার ভক্ষণ প্রণালী, তার চামড়ায় শীত নিবারণ ইত্যাকার শিকার ও পশুপালনমূলক অর্থনীতির জীবন যাত্রার চিত্রগুলি কুমারীবলীর সঙ্গে যুক্ত থেকে গেল।
আমাদের মনে রাখা দরকার, কৃষিকর্মমূলক অর্থনৈতিক জীবনে মৈথুন, হত্যা বা রুধিরের কোনো সম্পর্ক নেই; সার্থকতাও নেই। তবু, কৃষিযুগে পশুপালন পর্বে পরিকল্পিত পূজা-অনুষ্ঠানগুলো যুক্ত হল কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির পূজা অনুষ্ঠানে। এ যুগে দেবতারা মাতৃকা মাত্র হয়ে গেছেন প্রায়। মানুষের মা তিনি শস্যাদির [illegible]। তাই কুমারীদের বলি চাই সুস্থ সবল [illegible] আশায়। পশুপালন স্তরে এটা ছিল বিভিন্ন স্ত্রীপুরুষপশুর কোলাহলে, মানুষের সম্পদ সুস্থ সবল পশুপালকের আশায়। কিন্তু কৃষাণ মানবগোষ্ঠীর—যে মাতৃত্ব আসে কুমারীর উৎসর্গের পরে যে মাতৃত্ব নবজাত সন্তানকে ধারণ এবং পালন করে মানুষের ধন-জন-বল বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে পারে, তারই অঙ্কুর যে কুমারীদের অভিস্ফুরণে—ধর্মীয় চিন্তার অপব্যাখ্যায়, সেই কুমারীকে ছিন্নকণ্ঠ হতে হয়েছে নানাবিধ সময়ে বিভিন্নদেশের ভিন্নতর সভ্যতায়। প্রকৃতিতে আদিম হলেও এটা ছিল ধর্মীয় চিন্তার মধ্যযুগ।

কিন্তু, মানুষ যদি তার আদিম এবং মধ্যযুগীয় চিন্তায়,ধ্যান-ধারণায় আজও নিমগ্ন থাকতো তবে সেটাই হত তার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। সভ্যতার অগ্রগতি, মানুষের স্থিতধী প্রজ্ঞা, চিরসুন্দরকে পাবার দুর্দমনীয় আকাংক্ষা, বৃহত্তর জীবনে উত্তরণের একনিষ্ঠ অভীপ্সা—ধর্মের আদিম চিন্তা থেকে, মধ্যযুগীয় কলঙ্ক থেকে তাকে দূরে সরিয়ে এনেছে। দুঃখ করে লাভ নেই যে এ কলঙ্কের বোঝা তাকে এক সময় বহন করতে হয়েছে; বলে লাভ নেই যে এই ক্লেদাক্ত চিন্তায় একসময় মানুষের ধর্মীয় চিন্তার সাধনার পথ ক্লিন্ন ছিল না। সার্থক মানুষের সম্মুখের দিকে পদচারণা যদিও এখনও কুমারীবলি, নরবলি-সংক্রান্ত দেব-আরাধনার চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হয়েছে তা নয় (এখনও দু'একটি বলির বিক্ষিপ্ত ঘটনা কখনও কোথায় ও ঘটে), তবু ও তার মন যে স্বচ্ছ চিন্তার আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে, এটাই বড়ো কথা। প্রভাতের লগ্ন এখন। কাজেই স্পষ্ট দিবালোকের আলো যখন তার চিন্তার বিশ্বকে প্রোজ্জ্বল করে তুলবে, সেদিন সমস্ত সংস্কার-কুসংস্কারের কঠিন বাধা অপসারিত করে ভুল ব্যাখ্যার পশুবলির কলঙ্ক থেকে-ও সে বিমুক্ত হয়ে উঠবে।

তন্ত্রসাধকগণ* কিন্তু পশুবলির সমর্থন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, বহুকাল প্রচলিত এইসব অনুষ্ঠানে নতুন ভাবনাচিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। বর্তমান আলোচনায় শৈব এবং শাক্ততন্ত্রের আলোতে এই ভাবনাচিন্তার একটি অত্যন্ত সাধারণ রেখাচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করবো. গভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে।

শৈবমতে, নকুলীশ রচিত 'পাশুপতসূত্রম্'-এর ভাষ্যে পশুশব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৌণ্ডিন্য বলেছেন, সিদ্ধেশ্বর অর্থাৎ জীবন্মুক্তদের বাদ দিয়ে চেতনাবান সকলেই পশু।[১৩৭] একই ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন, দেহবোধই একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় চেতনা থাকা সত্ত্বেও জীবকে পশুনামে অভিহিত করা যায়।[১৩৮] শিবপুরাণের মতে ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সবই পশু।[১৩৯] অন্যদিকে কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে যে পশুরা ষড়দর্শন মহাকূপে পতিত। এরা পরমার্থ জ্ঞানহীন [১ম উল্লাস]। আবার কামাখ্যাতন্ত্র বলেছেন, হাতা যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ জানে না, সেইরূপ ষড়্দর্শনকূপে পতিত পশুরা পরমার্থ জানে না।[১৪০]

* তন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে বঙ্গীয় শব্দকোষ বলেছেন : তন্+ত্র (ষ্ট্রন্); অর্থ সন্তান, অপত্য, কুল, বংশ। তন্ ধাতুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করে অভিধানখানি ল্যাটিন ভাষার tenuis-এর উল্লেখ করেছেন। Tenuis-এর অর্থও tenuity শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, বিস্তার-ই এদের মূল অর্থানুষঙ্গ। কিন্তু তন্ত্রের প্রাথমিক অর্থ সন্তান, অপত্য। 'বিস্তার'-এর সঙ্গে 'অপত্য'-র ভাবানুষঙ্গগত মিল থাকলেও উভয়ে সর্বৈব এক নয়।

ইংরাজীতে tantrum বলে একটি শব্দ আছে, যার অভিধানগত অর্থ an outburst or display of petulance (manifesting perversity) or ill temper; a fit of passion। এর সবগুলি অর্থই তন্ত্রসাধনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। অন্যদিকে Oxford Dictionary (Compact Edition) অনুযায়ী, ভুল উচ্চারণের ফলে tantrum' কোনো একসময় 'anthem' এর সঙ্গে যুক্ত ছিল অভিধানখানি বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই; ব্যুৎপত্তি অনিশ্চিত। আমি বলিতে চাই মূলে তন্ত্র এবং tantrum একই ছিলো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে। পরে বিচ্ছিন্নতার যুগে এরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে।

১৩৭. অত্র পশবো নাম সিদ্ধেশ্বরবর্জং সর্বে চেতনাবন্তঃ।—১।১ এর ভাষ্য।

১৩৮. পশ্যনাৎ পশনাৎ চ পশবঃ।—ঐ।

১৩৯. ব্রহ্মাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ পশবঃ পরিকীর্তিতা :—৪।৬১

১৪০. ষড়্দর্শন মহাকূপে পতিতা পশবঃ প্রিয়ে।
পরমার্থং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা॥—অষ্টম পটল।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এখানে পশুর যে সংজ্ঞা নির্দেশিত তাতে বস্তুগত দিকের চেয়ে একটি নির্দিষ্ট দর্শনগত দৃষ্টিকোণই বেশি কাজ করেছে। কিন্তু তন্ত্র যেহেতু ক্রিয়ামূলক সাধনা, তাই সে পারিভাষিক দর্শনকে বাহুল্য মনে করে। দর্শন-গত দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে যদি তন্ত্রসাধনার বস্তুগত দিকটি ধরা যায় তবে ইংরাজী 'animal' এবং ভারতীয় ভাষার 'পশু' সমার্থক। এবং সেই অর্থে মানুষও পশু।

উৎসে যেটা ছিল আক্ষরিক অর্থের পশুকেন্দ্রিক তন্ত্রসাধন-পদ্ধতি, সেটাই পরবর্তী স্তরে এসে তিন রকম ভাবের উপাসনায় বিভক্ত হয়েছে—যথা পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব।[১৪১] অন্যত্র কিন্তু পশু এবং বীর—মূলত দুটি ভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে বীরভাবকেই সর্বোত্তম বলে 'দিব্য'কে বীরভাবের অতি সুন্দর ফলশ্রুতি বলা হয়েছে।[১৪২]

রুদ্রযামলের সাধনপদ্ধতিতে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতেও কিন্তু স্পষ্ট করেই দেখানো হয়েছে, কোনো পূজাপদ্ধতি প্রাথমিক স্তরে কি থাকে এবং কিভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তন ঘটে যায় [পশু→বীর→দিব্য]। [অবশ্য, প্রথম দুটি স্তরকে সম্পূর্ণ পৃথক বলা যাবে কিনা সে ব্যাপারে সংশয় আছে]। অন্যদিকে, কৌলাবলী নির্ণয় [১১/১]-এর চিত্রটি দেখুন : 'ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ'।

এখান থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসবো যে মানুষের ভাবনা-চিন্তা পূজাচরণ প্রথমে দিব্য থাকে, মধ্যস্তরে বীর এবং শেষে পশুস্তরে অবনমিত হয়? কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের কোনোক্ষেত্রেই এই পথরেখা স্বীকৃত নয়।

রুদ্রযামলের মতে 'বীর' সর্বোত্তম। পিচ্ছিলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে দিব্য এবং বীর—এরা মহাভাব, এবং পশুভাবকে বলা হয়েছে অধমভাব। 'দিব্যবীরৌ মহাভাবাধমঃ পশুভাবকঃ'।[১৪৩]

বাচ্যার্থে মানুষও পশু। তন্ত্র এই মানবরূপী পশুকে উত্তম পশু বলেছেন। তন্ত্রের পরিভাষায় 'স্বধর্মনিরত, শুদ্ধাচারী সাধারণ পশু'। এই পারিভাষিক পশু সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

১৪১. রুদ্রযামল, উত্তরতন্ত্রের ১১।২৮-২৯ শ্লোক :—
পশুভাবং প্রথমকে দ্বিতীয়ে বীরভাবকম্।
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ॥

১৪২. আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদবশ্যকম্।
বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমম্।
তৎ পশ্চাদতিসৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলম্॥ ঐ ৯।৫০-৫১।

১৪৩. প্রাণতোষিণীতন্ত্রধৃত বচন; সপ্তম কাণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ। বসুমতী সংস্করণ। ৬৬৮ পৃঃ

মনুষ্যচরিত্রে পশুপ্রকৃতির সকল চিহ্নই বর্তমান রহিয়াছে। যদিও আকৃতিতে মনুষ্যভাব মনুষ্যদেহে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি মনুষ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ গুণলাভ তীব্রসাধন সাপেক্ষ। মনুষ্যের দেহ পাইলেও মনুষ্যমাত্রেই এক হিসাবে পশু।...মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও জন্মপ্রাপ্ত পাশব-প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভের সাধনা করিতে হয়।

প্রাচীন তান্ত্রিক আচার্যগণ যথাবিধি অনুষ্ঠিত দীক্ষার দ্বারা ও উহার সংযম সদাচারাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা জীবকে পশুভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যতদিন পশুভাব নিবৃত্ত না হয় ততদিন পশুর আচারেই থাকিতে হয়, ইহাই ছিল তাঁহাদের নিয়ম। অর্থাৎ নৈতিক নিয়ম বা বিধিনিষেধের আবশ্যকতা ততদিন তাঁহারা স্বীকাব করিতেন।[১৪৪]

বীরভাবের সাধনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

বীরভাবের সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা? বীরভাবের সাধনার ফলে পুরুষ-প্রকৃতির দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। প্রকৃতিকে তখন আর পৃথক করিয়া রাখা হয় না এবং পুরুষ নিজেও প্রকৃতি হইতে পৃথক থাকে না। তখন পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ে মিলিয়া যামলভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের যুগল উপাসনা এবং বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধভাব। এই যামলভাবের ক্রমবিকাশ হইতে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই নাম দিব্যভাব।[১৪৫]

গোপীনাথ কবিরাজের মতে পশুভাব এবং বীরভাব আলাদা। কিন্তু দুটির মধ্যে বহিরঙ্গ দিক থেকে কোনো পার্থক্য আছে কি? তন্ত্রের লক্ষ্যে আমরা দেখি 'দেহজাত আদিরস'-এর সাহায্যে সাধনা। উদ্দেশ্য 'আমি এক হইতে বহু হইব'। এরই নাম সাধনা, আরাধনা, পূজা।

অন্যদিকে পশু জৈবিক নিয়ম অনুসারেই বিশেষ বিশেষ ঋতুতে অত্যন্ত সাধারণ-ভাবে মিলিত হয়; বংশধর সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজেদেরকে উপায় হিসারে প্রতিষ্ঠিত করে। বীরভাবের সাধনাতে প্রকৃত সৃষ্টি না করে সাধনপদ্ধতিতে সাধক-সাধিকা মিলিত হয়ে সুখ নয়, 'আনন্দ'-সাগরে নিমগ্ন হন। তফাৎ, এক ক্ষেত্রে সৃষ্টি-সহায়তা অন্য ক্ষেত্রে পারিভাষিক 'দিব্য'-আনন্দের উপলব্ধি।

পশুভাবে, পশুর আচরণে সৃষ্টি-প্রচেষ্টা। পরবর্তী তন্ত্রসাধনা তাকে অধম ——— বলেছেন। "বীরভাবের সাধনাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাধনা।" বীরভাবের

৮। 'দেহের সাধনা ও দিব্যাদি' ১৬ সেপ্টেম্বর সন ১৯৮২।

সাধনাকে বুঝতে হলে আগে 'বীর'-শব্দটির মৌলিক অর্থকে অনুধাবনের প্রয়োজন রয়েছে।

আজ 'বীর'-শব্দের অর্থ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে তাকে আর স্ব-রূপে চিনে নেবার উপায় নেই। ভারতের প্রাচীনতম লিখিত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু ব্যবহারের শব্দটি যুগোপযোগী অর্থ পরিবর্তন করে চলেছে। ঋক্‌সূক্তেও শব্দটিকে যখন ব্যবহৃত হতে দেখি তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এটি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ঋক্‌সূক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থ অথবা গৃহ্যসূত্র—শব্দটি সর্বত্রই পুরুষবাচক, স্ত্রী নয়; অথর্ববেদে, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে শব্দটির দ্বারা পুরুষ-প্রজাতির পশুকে বোঝায়।[১৪৬] অন্যদিকে ল্যাটিনে 'বীর'-এর অনুরূপ শব্দ Vir; শব্দটি আবেস্তায় এবং লিথুয়ানিয়ান ভাষায় আছে। ইংরেজী ভাষার virility, virago, viragate, virgin প্রভৃতি শব্দ দেখলেই বোঝা যাবে শব্দটির মূলগত অর্থ কি ছিল। শব্দটি নিজে পুরুষবাচক প্রাণীকে বুঝায়। virility, viragate শব্দ থেকে এমন একটি অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা থেকে মনে হয় মূলে এটি ছিল পুরুষাঙ্গবাচক। তন্ত্রসাধনায় বীরাচারী, ভৈরব প্রভৃতি শব্দও মূলে অনুরূপ অর্থানুষঙ্গবহ ছিল। virility শব্দটির অর্থই পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা; নারীর নয়, পুরুষের আচরণ।

যাই হোক, বীরাচারী-সাধক যে পন্থায় সাধনা করেন তাতে যামল-আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়ে 'দিব্য' ভাবে উন্নীত হতে পারেন হয়তো, কিন্তু এই পন্থায় সৃষ্টিরহস্যকে জানার কোনো বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব কিনা জানি না। বা 'বীরভাবের সাধনার ফলে পুরুষ-প্রকৃতির দ্বন্দ্ব' বাস্তবিক 'মিটিয়া যায়' কিনা তা-ও জানা নেই। বাস্তবজীবনে, বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে এই দ্বন্দ্ব যে এখনও মেটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—আমাদের নারীসমাজের শিক্ষা ও সংস্কারগত দৈন্য।

এই আলোচনার প্রয়োজন হলো এই জন্য যে বাস্তব ক্ষেত্রে পশুভাব এবং বীরভাব—এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ বলে মনে হয়। তবু কৌলাবলীনির্ণয়ে কৌলাচারীদের এবং গুপ্তসাধনতন্ত্রে, মহানির্বাণতন্ত্রে, কুলার্ণব তন্ত্রে, নীলতন্ত্রে বীরাচারীদের সাধনাকে পশ্বাচারীদের সাধনা থেকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে মতবাদের দ্বন্দ্ব বলা যেতে পারে, যদিও মনে রাখতে হবে পশুগমনও পশ্বাচার তথা পশুভাবের অন্তর্গত।

১৪৬. M. M. Williams : A Sanskrit English Dictionary ; 'বীর' শব্দ দ্রষ্টব্য। শব্দটির 'ব' বর্গীয় ব, অন্তঃস্থ 'ব'। উচ্চারণ কতকটা ইংরেজী 'V'-এর মত।

পরবর্তীকালের তান্ত্রিক মতে বীরাচারের যুগ্মভাবের সাধনাকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা বলা হয়েছে। কারণ "যামলভাবের ক্রমবিকাশ হইতে সাম্যভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারই নাম দিব্যভাব"। দিব্যভাবের জগতে উত্তরণই যদি সাধক-সাধিকার অভীষ্ট, তবে কেন তাঁরা একে 'অতি গোপনীয়' আখ্যা দিলেন ?—'ইয়ং তু শাম্ভবী বিদ্যা গোপ্যা কুলবধূরিব।' কেন এই উক্তি ?

পশ্বাচার নিন্দিত। বীরভাবের সাধনা গোপনীয় এই কারণে যে এটি ক্রিয়ামূলক। ক্রিয়া দ্বিবিধ—মানসিক এবং দৈহিক। পশুভাবই হোক আর বীরভাবই হোক, উভয়েই দৈহিক-ক্রিয়ামূলক। এই ক্রিয়ায় সাম্যরসের বিশুদ্ধ আনন্দ (নিঃসংশয়ে দৈহিক) অনুভব করতে না পারলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অজানা থাকে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তন্ত্রের মূল লক্ষ্য যেখানে বহুধা হবার উপায় আবিষ্কারের জ্ঞানের অনুসন্ধান সে জ্ঞান বীরভাবের সাধন-পন্থায় কতটুকু পাওয়া যেতে পারে ? তাছাড়া বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নতি-বিধান যেখানে লক্ষ্য, সেই সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছুতে এই সাধন-পন্থা কতখানি সাহায্যকারী ? পশ্বাচারে বা বীরাচারে নারীকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায় কতদূর সাহায্য করা সম্ভব ? সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে এ প্রশ্ন কি আসতে পারে না ?

ইতিপূর্বে, তান্ত্রিকপদ্ধতি-বলির-প্রসঙ্গ আনা হলেও এবার নির্দিষ্টভাবে বলির বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এই শব্দটিরও অর্থান্তর ঘটেছে। তান্ত্রিক মতে শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ নিধন, হত্যা বা জীবনান্তীকরণ। কিন্তু সাধারণ পূজাপদ্ধতিতে এর অর্থ উপহার বা উপচার। পূজায় দেবতাকে যা নিবেদন করা যায় তা-ই বলি। এই অর্থে ষোড়শোপচার বা অষ্টাদশোপচারও বলি নামে অভিহিত হবার যোগ্য। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের টীকাকার হরদত্তের মতে সপ্তপাক-যজ্ঞের মধ্যে সর্পবলি এবং ঈশানবলি অন্যতম পাকযজ্ঞ। একোদ্দিষ্টের পর যজুর্বেদী ব্রাহ্মণদের পক্ষে [illegible]বলি বিহিত। তন্ত্রমতে শৃগালকে নির্জন প্রান্তরে মাংসযুক্ত নৈবেদ্য দেবার নাম 'শিবাবলি'। সারস্বত-প্রয়োগে দধিপিষ্টক ও মধুমিশ্রিত পায়সবলি বিহিত। মারণকর্মে চৌরাস্তায় পোড়া-মাছ রক্ত অন্নপিণ্ড ও হলুদ-মাখানো-কাঁচা-মাংস দিয়ে বলিপ্রদান করা হয়। পৌরাণিক তথা তান্ত্রিক দেবদেবীদের অর্চনাকালে [illegible] 'মাষভক্ত-বলি' দেওয়া হয় (পুরোহিতদর্পণ বা. ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি

দ্রষ্টব্য)। কৌলাচার সাধনতান্ত্রিকদের বিভিন্ন দেবোদ্দেশে বলি নিবেদন করতে হয়।—

পশ্চিমে বটুকং দেবমুত্তরে যোগিনীবলিম্
পূর্বে ভূতবলিং দত্বাৎ ক্ষেত্রপালঞ্চ দক্ষিণে।
রাজরাজেশ্বর মধ্যে পূজয়েৎ কুলনায়িকে॥ কুলার্ণবতন্ত্র, ৭।৩০।

বলি দ্বিবিধ—সাত্ত্বিক ও রাজসিক। মাংসরক্তাদি বর্জিত বলি সাত্ত্বিক; এগুলি থাকলে রাজসিক। রক্তমাংসের প্রসঙ্গ এলেই বলতে হয়—এগুলি পশুঘাতন-কেন্দ্রিক।[১৪৭] তন্ত্রে বলির প্রশংসা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিত্যপূজায় পশুবলি দিতে পারে, সে কেবল বলিদানের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করবে। (এই লক্ষ্যেই একসময়ে রাজা মহারাজা, সামন্ত-ভূস্বামী অথবা ডাকাতদের পশুবলি, নরবলি দানে উৎসাহিত করেছে)। দরিদ্র ব্যক্তিকে, নিত্যপূজায় না করলেও, বৎসরান্তে একটি বলি দিতে হবে, অন্যথায় সারাজীবনেও তার সিদ্ধিলাভ হবে না। কলিতে অশ্বমেধ যজ্ঞ নেই; বলিদানই মহাযজ্ঞ, বলিদানেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।[১৪৮]

মানবকল্যাণকামী সুস্থ চিন্তার কোনো সংস্কৃতিবান সমাজই আজ আর নরবলিকে স্বীকার করে না। তবু দেখি, যেহেতু প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ তাই তন্ত্রে নরবলিকেই শ্রেষ্ঠ বলি বলা হয়েছে। এটা রাষ্ট্রীয় বিধানে অপরাধ, সম্ভবত একারণেই তন্ত্র কেবল রাজাকেই সর্বশক্তিমান জেনে নরবলির অধিকার দিয়েছে।—'রাজা নরবলিং দত্বাৎ নান্যেঽপি পরমেশ্বরি'।[১৪৯]

সাধারণ মানুষও যে এককালের রাজার মত সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবার

১৪৭. পশুদানং বিনা দেবীং পূজয়েন্ন কদাচান।—ম'তৃম ভেদতন্ত্র ১০।১৩-১৭

১৪৮. তথা চ নিত্যপূজায়াং যদি শক্তোভবেন্নরঃ।
কেবলং বলিদানেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥
নির্ধনঃ পরমেশানি যদি পূজাদিক চরেৎ।
বৎসরান্তে প্রদাতব্যং বলিমেকং সুরেশ্বরি॥
অন্যথা নৈবসিদ্ধিঃ স্যাদাজন্মপূজনাদপি।
বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চণ্ডিকে॥
অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞ কলৌ নাস্তি সুরেশ্বরি।
কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধফলং লভেৎ॥

১৪৯. যামলতন্ত্রবচন। শ্যামারহস্য, ৩য় পটল।

আকাংক্ষা পোষণ করতে পারে, এই তন্ত্র সেদিকে লক্ষ্য রাখেনি বলে, এই ধরণের তান্ত্রিক-অনুশাসনের ফলে নরনারীর কুমারীহত্যার, মতন ঘৃণ্য অপরাধ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ এই ধরণের অপরাধের একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে কলিকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায়।[১৫০] ন'বছর বয়সের একটি বালককে কুড়ুল দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এক মন্দিরে। স্থান উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছে নাসিকে। এখানে রোগগ্রস্ত পিতা নিজের ছ' বছরের পুত্রকে ত্রিশূল দিয়ে হত্যা করে তার রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে দেবীমূর্তির গায়ে মনস্কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্য।[১৫১]

কবন্ধরুধির দেব বা দেবীমূর্তির গায়ে ছড়িয়ে দিলে দেবতাকুল তৃপ্ত হন, এই বিশ্বাসে ছ'টি কুমারী হত্যা হয়েছে ত্রিম্বকে; একই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান দেখেছি

১৫০. Amrita Bazar Patrika, Calcutta 1 April 1981.

The horrid story of how a son murdered his father with the ostensible object of acquring supernatural powers was known at the West Bengal police headquarters at Writers' Buildings on Tuesday .

According to the Police reports, Kasem Mandal of Bhaduriapara in Mursidabad killed his father at the dead of night on March 28 as advised by a fakir. A goat and a kid were also sacrificed for the attainment of supernatural Power. p 4/8.

১৫১. *The Statesman, Calcutta dt. 10. 4 83 p. 9/7* Bulandshahr, (Uttar Pradesh, April 9 , A nine-year-old boy has been sacrificed to propitiate gods in a monestery in Tilpata village near Padre town early this week, reports P. T I

As the boy did not return home after meals, the worried family members made an extensive search and found his body in the monestery.

An axe used in the murder has been recovored, reports said

The Statesman, calcutta dt. 9. 5. 83, p. 7/1

Nasik, May 8—A six-year old boy became a human sacrifice when his his father stabbed him to death with a "trishul" in the precincts of a temple at Vadala Pimpla, about 20 km from Sinnar, near here, reports p.T.I.

Mahadu Shunkar pawer took his six-year-old son, Navnath, for "darshan" to a temple in the village, where he removed the childs' clothes, stabbed him and sprayed his blood on the idol of the goddess on Friday evening, the Sinnar police said today.

The police said pawer, a devote of "Miravali Baba", had been in a disturbed mental state for some time.

আজটেক দেবী চিকোমেকেহুয়াতল এক শারদপূজায়। আমার বাল্যে এক বিখ্যাত শীতলামন্দিরে (ঢাকা জেলায়) নিহত শতাধিক পাঁঠার রক্ত ছড়িয়ে দিতে দেখেছি পুরোহিতকে, দেবীমূর্তির গায়ে।

পশুপক্ষিসরীসৃপ—এগুলি মানুষের খাদ্যতালিকাভুক্ত। এদের হত্যা এখনও মানুষ কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই করে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নরমাংসও ভক্ষিত হয়েছে, এখনও হয় কোনো কোনো জায়গায়। কিন্তু নরহত্যা বা নরবলি কেবল নিন্দিত নয়, এটা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিচারে অপরাধ। দেবপূজার নামে, অলৌকিক শক্তি অর্জনের নামে এই হত্যাও তাই। তবু এ ধরণের বলির পেছনে ধর্মীয় চিন্তার অপ-অনুশাসনের ধারাকে কি সমাজ-সচেতনতার দৃষ্টিতে আমরা নিন্দনীয় বলে গ্রহণ করবো না? মানুষকে, পূজায় হত্যার আদি ও আদিম চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবো না?

কুমারীবলির চিত্র থাকলেও স্ত্রী-পশুবধের চিত্র আমাদের দেশে প্রায় নেই। কালিকাপুরাণ সাধারণভাবে স্ত্রী-পশুবধের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করলেও বহুসংখ্যক বলির ক্ষেত্রে তা শিথিলীকৃত।[১৫২] লৌকিক দেবপূজায় কিন্তু স্ত্রী-পশুর বলিই বিহিত। একটি উদাহরণ এই রকম: চট্টগ্রাম জেলার একটি গ্রাম ধোরোলা। সেখানে এক পুরানো বটগাছের তলায় বিশেষ সময়ে মন্দেশ্বরীর [মন্দেশ্বরী?] পূজা হয় পশুবলি সহযোগে। ছড়ার আকারে ঐ অঞ্চলের একটি প্রবাদ: ফাঁড়াবে খাড়ে ফাঁড়ি হাঁসে। / ফাঁড়া কয় যে তোর লাই মা মন্দেশ্বরী আছে॥ [পাঁঠাকে কাটে পাঁঠি হাসে পাঁঠা কয় যে তোর লাই মা মন্দেশ্বরী আছে।][১৫৩]

পশুপক্ষিসরীসৃপ, মানুষ—মানুষের পূজাচিন্তার একটি বিশেষ যুগে এরা নিহত হয়েছে, আজও হচ্ছে। বিবিধ কারণে বলির চিন্তা আজও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তন্ত্র-সাধনা বলির চিন্তাকে ঠিক রেখে প্রকৃত প্রাণীর পরিবর্তে

---

১৫২. পশূনাং পক্ষিণাং বাপি নরানাঞ্চ বিশেষতঃ।
স্ত্রিয়ং ন দদ্যাৎ বলীন্ দত্বা নরকমাপ্নুয়াৎ॥
সজ্জাতবলিদানেষু যোষিতং পশুপক্ষিণঃ।
বলিং দদ্যান্মানুষীন্তু ত্যক্ত্বা সজ্জাতপূজিতম্॥ ৬৭।১০১-১০২।

১৫৩. প্রসঙ্গটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে সংগৃহীত।

তাদের প্রতীক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। একখানি তন্ত্র বৌদ্ধযুগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে বলিকে নিষিদ্ধ করার চিন্তা এসেছিল ওই ধর্ম থেকেই।[১৫৪]

বৌদ্ধধর্ম, বিশেষ করে পূজা পদ্ধতিতে, পশুবলির বিরুদ্ধে সোচ্চার। মনে হয়, তার প্রভাব তন্ত্রসাধনার ওপর পড়েছে। ফলে প্রথা নিষিদ্ধ না হলেও সে প্রতীকিত হলো। কালিকাপুরাণ বলেছেন, 'ঘৃতময় পিষ্টক বা যবচূর্ণময় ব্যাঘ্র, মনুষ্য অথবা সিংহ নির্মাণ করে তাকে মন্ত্রের দ্বারা সংস্কার করে চন্দ্রহাস অস্ত্রের দ্বারা বলিদান বিধেয় ছিল।[১৫৫] একই ভাবে নির্মিত 'শত্রুবলি'-র বিধান আছে তন্ত্রসাধনে।

এই বিকল্প-বলির বিধান দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, মূর্তি নির্মাণের ক্ষমতা মানুষ যখন অর্জন করেছে, মূল 'পশু' পাওয়ার অসুবিধা যে ক্ষেত্রে যখনই দেখা দিয়েছে তখনই এই ধরণের বিকল্প বলির ব্যবস্থা করেছে সে। এ রীতি শুধু ভারতে নয়, প্রাচীন মিশরেও এই ধরণের কুমারীমূর্তি নির্মাণ করে বলি দেওয়ার রীতি ছিল। বলির প্রথা ছিল—মোমের মূর্তি তৈরি করে নীলনদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া, বন্যারোধের জন্য।[১৫৬] মাটির 'মাল'-বলির রীতি এককালে প্রচলিত ছিল ঝাড়গ্রাম সাবিত্রীমন্দিরে।

একদিকে সে যেমন হয়েছে ভাস্কর, অন্যদিকে তেমনিই মানুষের অনুসন্ধিৎসু চোখ বনজ সম্পদে খুঁজে বেড়িয়েছে প্রতীককে। তন্ত্রসাধকদের দৃষ্টি সেদিকেও প্রসারিত হয়ে 'পশু'র প্রতীক হয়েছে বিভিন্ন ফলমূল (কৃষিজীবী জীবনযাত্রা থেকে এগুলি এসেছে এমন চিন্তা করার কোনো হেতু নেই)। 'মোষের অনুকল্প হলো চালকুমড়ো, ছাগলের কাঁকুড়, মুরগীর বেগুন, মোষের লাউ, মানুষের কাঁটাল এবং মাছের আখ।'[১৫৭]

---

১৫৪. যত্র যত্র পুরাণেষু নিষেধং কুরুতে বলেঃ
তত্তদ্ বৌদ্ধমতং রাজন্ ন চ বেদেষু সম্মতম্।—গায়ত্রীতন্ত্র

১৫৫. কৃত্বা ঘৃতময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ ভৈরব
অথবা পুপবিকৃতং যবক্ষোদময়ঞ্চ বা
ঘাতয়েচ্চন্দ্রহাসেন তেন মন্ত্রেণ সংস্কৃতম্

১৫৬. O. A. Wall : Sex and Sexworship : p. 223.

১৫৭. মাহিষত্বেন কুষ্মাণ্ডং ছাগত্বেনৈব কর্কটীং
বৃন্তাকং কুক্কুটত্বেনচ তুম্বিকাম্।
মনুষ্যত্বেন পনসং মৎস্যত্বেনেক্ষু দণ্ডকম্॥—পুরশ্চর্যার্ণব, একাদশ তরঙ্গ, পৃ, ১০৬২
(নেপালের মহারাজা প্রতাপসিংহ বাহাদুরবর্ম রচিত)।

মূর্তিই হোক, আর প্রতীক-ই হোক, তন্ত্রসাধনা কোনো স্তরেই বলিচিন্তার সীমানার বাইরে যেতে পারলো না। 'পশুদানং বিনা দেবী পূজয়েন্ন কদাচন'। —মাতৃকাতন্ত্রভেদ। ১০/১৩।

কেন বলির চিন্তা? মানবেতর পশু-ই হোক আর 'মহাপশু' হোক, বলির ধ্যান-ধারণা মানুষের মনে কেন আদিম স্তরে এসেছিল, সে বিষয়ে আগেই বলেছি। ঋতুশোণিত-ই যে তার মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, একথাও আগেই বলবার চেষ্টা করেছি। তন্ত্রবচনেও কিন্তু এই বক্তব্যের সমর্থন-ই পাই।

কুমারী অর্থে মাতৃকাশক্তি বা স্ত্রীদেবতা অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়ায় উন্মুক্ত অথবা প্রস্তুত দেবী। কুমারী মানবীকন্যা এরই রূপ। বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে বহুধা হবার প্রবণতা থেকেই মানুষের বা অন্য জীবের মিলন প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি পৌরোহিত্য-কল্পিত দেবতার ওপরেও ক্রমে আরোপিত হয়েছে। 'স একাকী তদা নৈব রমতে স্ম সনাতনঃ'—এই জন্যই নারীর প্রয়োজন। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রের কুমারী স্তুতি এই কারণেই। কন্যা-কুমারীকায়াতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী-কুমারীও বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়ে শিবের অপেক্ষায় রয়েছেন—এই বর্ণনাই পাওয়া যায়। কুমারসম্ভব-কাব্যেও কালিদাস এই চিত্রই এঁকেছেন। রেডইণ্ডিয়ানদের চিচেকামেকোহয়াতল-কুমারীকেও হত্যার আগে হুইটজিলোপোক্তলি দেবের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

যেহেতু তন্ত্রসাধনা ক্রিয়াপ্রধান, তন্ত্রগুলি মূলত শিব বা ভৈরব-মহিমা কীর্তনে মুখর, যেহেতু আগমশাস্ত্রে শিব প্রবক্তা শিবানী মূলত শ্রোত্রীর ভূমিকা পালন করেন তাই সৃষ্টি কামনা-উন্মুখ দেবীর বা কুমারীর মনোজগৎ আমরা দেখতে পাইনা। শিলাভট্টারিকার 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' থেকে কবিতায় যেমন, ঠিক তেমনি পাই কুমারসম্ভবের 'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী,—এই নির্দিষ্ট শ্লোকটিতে। তন্ত্রসাধনার 'কমল' সৃষ্টিকামনা-উন্মুখ গৌরীর মনোজগৎ-কে এক ব্যঞ্জনাময়তার মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে চরণটিতে।

তন্ত্রমতে মাতৃকাশক্তি বা স্ত্রীদেবতা সকলেই কুমারী, তাই দেবীমূর্তি তৈরীতে কখনোই তাদের বালিকা বা প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা দেখানো হয় না। ধ্যানমন্ত্রগুলিও সেই সাক্ষ্যই বহন করে। কালিকা মূর্তির পাশে দুটি প্রলম্বিতস্তনী রক্তপিপাসু নারীমূর্তি দেওয়া থাকে এইজন্য যে, যেহেতু তাদের সৃষ্টিক্ষমতা অন্তর্হিত তাই সৃষ্টিরুধির পানের মধ্য দিয়ে প্রজনন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে উন্মুখ তারা;—ঠিক যেভাবে আকাংক্ষিত হয়ে ছ'টি কুমারীর হত্যাকাণ্ড ঘটানোর নায়িকা ত্রিম্বকের

'কোলি' সম্প্রদায়ের বিত্তশালিনী নারী বেতাল-মহারাজের সন্তুষ্টি-বিধানের পথ খুঁজেছে।

তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে, নারীর রক্তকে বিশেষ করে ঋতুমতী নারীকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। তান্ত্রিকহোমে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান করে নেবার কথা আছে। আদিম মানুষের মধ্যেও নারী-শোণিত অতিপবিত্র—এমন ধারণা ছিল।[১৫৮]

সাধারণভাবে ঋতুমতী তরুণীকন্যাকে কুমারী বলা হয়।

কিন্তু শব্দটি, ব্যবহারের দিক থেকে, সমাজ বিবর্তনের ফলে সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, শব্দার্থের ক্ষীণায়ণ ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেবদেবী যারা কুমার বা কুমারী আখ্যা পেয়েছেন, শিবের মতন দু একজন ছাড়া প্রায় সকলেই তরুণ তরুণী। চার সন্তানের জননী আমাদের দুর্গা স্তবে, ধ্যানে কৌমারী দেবী, মূর্তিতে তরুণী। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে দেবী বলেছেন, 'নাথ আমিও কুমার, তুমিও কুমারী অর্থাৎ, সমস্ত কুমারীই তোমার আমার অংশ।'

আগেই বলেছি, প্রচলিত অর্থে কুমারী বলতে আমরা বুঝি অবিবাহিত অথবা পুরুষকর্তৃক অস্পৃষ্টা কন্যা। তা হলে কি ধর্মীয় চিন্তায় কুমারী শব্দটিকে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে? তা নয়।

যেহেতু দেবচিন্তা, ভগবৎ-চিন্তার পিছনে আছে সৃষ্টি এবং তার রহস্য চিন্তা, তাই সেখানে মানুষ সেই সৃষ্টিক্ষমতা লক্ষ্য করেছে, তাকেই দেবচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

পুরুষ ও প্রকৃতির দেহে এবং মনে যে সৃষ্টি ও সন্তান ধারণের ক্ষমতা, তা-ই কৌমার। তরুণ তরুণীদের মধ্যে এই ক্ষমতা আছে বলেই তারা কুমার কুমারী।

যেহেতু চিরকালের মানুষকে জীবন ধারণের জন্য, বংশরক্ষার জন্য এই সৃষ্টির ক্ষমতা তথা কৌমারের উপর নির্ভর করতে হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুতে সে নিখুঁতভাবে কৌমার্যের লক্ষণকে বেছে নিতে পেরেছিল। সে দেখেছিল প্রাণী বা বৃক্ষজগতে এমন কিছু কিছু নমুনা আছে যারা একবার ফল বা সন্তান দিয়েই মরে যায়। বৃক্ষজগতে এরা ওষধি নামে পরিচিত। প্রাণী জগতে কাঁকড়া-জাতীয় জীবও

---

১৫৮. A. A. Macdonall : Lectures on Comparative Religion, Calcutta 1925, p 17.

বিশেষ কারণে একবার সন্তান ধারণের পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু পশুপাখি, মানুষ এরা একাধিকবার সন্তানের জন্ম দেয়। একটি সন্তানের পরই এদের সৃষ্টি ক্ষমতা অর্থাৎ কৌমার্য নষ্ট হয়ে যায় না। সন্তান প্রসবের পরই আবার তা ফিরে আসে। তাই পৃথিবীর সকল দেশের দেবীরা বহু সন্তানের জননী হয়েও কুমারী।

কুমারীত্বের এই সত্যের প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি মৎস্যগন্ধার প্রতি পরাশরের, কুন্তীর প্রতি সূর্যের আশীর্বাদ তথা বরে। সন্তান জন্মের পর এর দু-জনেই কুমারীত্ব ফিরে পাবেন। এটা কোনো ঋষি বা দেবতার অলৌকিক মহিমার ফলে নয়। এটা মানবী সমেত অধিকাংশ স্ত্রী-প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য। এটা জৈবিক নিয়ম।

সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া, কুমারীত্বের অর্থসংকোচন—এগুলিকে মূলধন করে পৌরোহিত্য দেবতা বা ঋষির নামে আপন কামনাকে চরিতার্থ করেছে। আর তারই গল্পকাহিনী মৎস্যগন্ধা, কুন্তীর পুনঃ কৌমার্যপ্রাপ্তির পুরাণকথায়। মানুষের প্রতিষ্ঠানিক ধর্মীয় চিন্তায় দেবতা পেয়েছেন অলৌকিক মহিমা।

পুষ্পোৎসবের পর সার্থক মিলন ঘটলে নারীজঠরে নতুন প্রাণের সূত্রপাত ঘটে। নবোন্মেষিত-প্রাণ শিশু যতদিন পর্যন্ত না ভূমিষ্ঠ হয় ততদিন আর তার নবতর সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না' অর্থাৎ তার কৌমার্য নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, ঠিক তার পর থেকেই নারীর মধ্যে কৌমার্য অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষমতা পুন-রুজ্জীবিত হতে থাকে জৈবিক নিয়মেই। সন্তান ধারণ, প্রসব, নবতর সন্তান ধারণের ক্ষমতা তথা কৌমার্য জৈবিক নিয়মেই আবর্তিত হতে থাকে নারীর ক্ষেত্রে একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত। যতদিন পর্যন্ত সে প্রজনন-ক্ষমা, অবিবাহিতই হোক, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধই হোক আর সন্তানবতীই হোক—ততদিন পর্যন্ত সে কুমারী। এককথায় কুমারীত্ব অর্থ সন্তানধারণ এবং প্রসবের ক্ষমতা।[১৫৯]

কোনো কোনো সভ্যতায় বারবণিতা, এমন কি বিবাহিতা সন্তানহীনা নারীও কুমারী আখ্যা পেয়ে থাকে।[১৬০] গ্রীক দেবী আর্তেমিস এণ্ডোমিয়নের ঔরসজাত পঞ্চাশটি কন্যার জননী হয়েও কুমারী।[১৬১] সেমেটিক জাতির 'আ'দদেবী 'ননা' বা

১৫৯. দীনেন্দ্রকুমার সরকার : কুমারীমৃত্তিকা ও কুমারীপূজা, আন্তর্জাতিক, ওকিও ইউ. এস. এ., নভেম্বর-জানুয়ারী ১৯৮২-৮৩, পৃ. ৬।

১৬০. Maria Leach : The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend : See 'Virginity'.

১৬১. Ibid. *op. cit.*

'ননই' নামে পরিচিতা। সুমেরীয় দেবী 'ননা'-র বাহন সিংহ, তাঁর স্বামীর বাহন বৃষ।[১৬২] স্বামীসহ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ইনি কুমারী।[১৬৩] হুবিষ্কের একটি মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেবদেবীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে দেবীকে 'ননা' এবং তাঁর স্বামীকে 'উমেশ' বলা হয়েছে। 'উমা'-'ঈশ' শব্দ দুটি ভারতীয় উমা-মহেশকে মনে করিয়ে দেয়।

ঋগ্বেদে মা অর্থে 'ননা' শব্দের উল্লেখের কথা বলেছেন কেউ।[১৬৪] ইনি প্রজনন শক্তির বিগ্রহ। যে ঋক্‌সূক্ত সম্বন্ধে উপরিউক্ত বক্তব্য সেটি ৯/১১২/৩ সংখ্যক। হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত গ্রন্থে শব্দটি 'ননা'র পরিবর্তে 'নানা' হয়ে কন্যা অর্থ পেয়েছে।[১৬৫] ভারতের একান্ন তান্ত্রিক দেবী-পীঠস্থানের অন্যতমটি হিঙ্গুলা বা হিংলাজ। এখানে দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র নিক্ষিপ্ত হয় বলে কথিত। হিংলাজের দেবী-মন্দির ওখানে 'নানী কি হজ' নামে কথিত। সুমেরীয় 'ননা', ঋক্‌সূক্তের 'ননা' বা 'নানা', হিংলাজের 'নানী' মূলে একই দেবী বলে মনে হয়। দেবী 'ননা' বা 'ননইয়া'র প্রতিকৃতিতে ভ্রমরের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।[১৬৬] মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৯১/৪৯ দেবী ভাগবতে (১০/১৩/২৩) দেবী ভ্রামরী নামে পরিচিতা। ভ্রমর বা এই জাতীয় পতঙ্গ, গুবরেপোকা অথবা বৃশ্চিক—এগুলোর সঙ্গে দেবচিন্তার সম্পর্ক অন্যত্র আলোচনা করেছি।[১৬৭]

মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই দেবী আবার কৌমারী 'শিখিবাহনা' অর্থাৎ কুমার বা কার্তিকেয়র শক্তি। কুমারসম্ভব অথবা অন্যত্র দেবী কার্তিকেয়-জননী। অর্থাৎ

১৬২. Pre-Aryan Elements in Indian Culture : Indian Historilac Quarterly. Vol.X, p. 15.

১৬৩. Ibid. Pp . 15-16.

১৬৪. The Great Godess of India and Iran : Indian Historical Quarterly. Vol X, p. 4o9.

১৬৫. কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী নানা।
নানাধিয়ো বসূযবোঽনুগা ইব তস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব।—(…কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জনকারিণী…)। ঋগবেদ ২য় খণ্ড ৪৩৬ পৃ।

১৬৬. Prototype of Siva in Western Asia.D.R. Vandarkar Volume. Bimala Charan Law.P. 3o2; Indian Research Institute, Calcutta 1940

১৬৭. দীনেন্দ্রকুমার সরকার : টুসুব্রতের উৎসচিন্তা, লোকসংস্কৃতি, (বৈশাখ চৈত্র ১৩৮৭ কলকাতা। এবং শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত : টুসু: ইতিহাস ও সঙ্গীতে, কলকাতা দ্রষ্টব্য।

দেবীকে কখনও মাতা, কখনও দয়িতা কল্পনা করা হচ্ছে। এই কল্পনা শুধু ভারতেরই নয়, প্রাচীন পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস-রোম সর্বত্র একই ধ্যানধারণা। ব্যাবিলন-আসীরীয় মহাদেবী 'ইস্তার' প্রজনন প্রেম এবং পারিবারিক সুখ-সম্পদের দেবী। এঁর সহচর-রূপে কল্পিত পুরুষদেবতা 'তম্মুজ' বা 'অশুর' যথাক্রমে ব্যাবিলন এবং আসীরিয়ায়।[১৬৮] এই দেবতাটিকে ইস্তারের পুত্র, পতি, ভ্রাতা সবই কল্পনা করা হয়। হখামনীষীয় সভ্যতায় দেবীর নাম 'অনাহিত', স্বামীর নাম 'মিথ্র'। সমস্ত প্রাণীকুলের প্রজননই এই দেবীর কৃপার উপর নির্ভরশীল।[১৬৯] পুরুষের বীর্য, নারীর গর্ভ এবং স্তন্য তিনিই পবিত্র করতেন। বিবাহ কামনায় কুমারী, সুপ্রসব কামনা বিবাহিতা নারীর পূজা পেতেন প্রাচীন পারস্যের এই দেবী।

প্রাচীন সভ্যতার অনেকগুলিতে এইসব দেবীর পূজাপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ ছিল নারীকুলের পতিতাবৃত্তির অনুষ্ঠান। 'ননা'-র পূজায় ছিল অবাধ যৌন-মিলন, 'অনাহিত' দেবীর মন্দির ছিল ইরাণের অকিলেসিন জনপদের 'এরিজ'-এ। এখানে ছিল দেবীর স্বর্ণময়ী মূর্তি। এই মন্দিরে অভিজাত-বংশীয়া কুমারীরা, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করতো।[১৭০] দাস পরিবারের মেয়েরা করতো 'পবিত্র পতিতা-বৃত্তি।[১৭১] ভারতে মাতৃকাদেবী-প্রধানা দুর্গা। এঁর পূজায় মূর্তি নির্মাণে বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকার অবশ্য প্রয়োজন। রাঢ় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন পুরুষকে নারী সাজিয়ে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যে গায়ক-গোষ্ঠী পথ পরিক্রমা করে, তাদের গানের কথা-বস্তুতে অশ্লীলতার ভগ্নাবশেষ এখনও শোনা যায়। কেনানে 'বাআল' বা 'ব্যাল' (প্রজননে পুরুষ-শক্তি) এবং 'অশেরা' (স্ত্রী-শক্তি)-র একক পূজার বিধান ছিল। এই পূজাতেও যৌনক্রিয়ার প্রতীক অনুষ্ঠান বিহিত ছিল। মন্দিরে একদল সেবিকা এই উদ্দেশ্যেই থাকতো।[১৭২] ফিনিসিয়ার দেবী 'সিবিলি' ছিলেন প্রেম যৌনমিলনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[১৭৩]

১৬৮. Rudra Siva : Dr. N. Benkataramanayya, University of Madras Pp. 61-64

১৬৯. Emile Benvenite : The Persian Religion, Pp. 61-62.

১৭০. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 1, p. 415.

১৭১. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend See 'Anahita'.

১৭২. History of Religion, p. 166-

১৭৩. Sex and Sexworship, p. 509.

সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন পর্বে পূজাপ্রাপ্ত এইসব দেবীগণ কুমারী পদবাচ্য হয়েও 'বারবণিতা, আখ্যা পান। অন্যদিকে, দেবীমন্দিরের সেবিকারা সমকালের পৌরোহিত্যের নির্দেশেই দেবীর কৃপালাভের জন্য, পূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হন। ভারতের বিভিন্ন দেব-দেবী মন্দিরে আজও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেনাপাওনা উপন্যাসে এই বৃত্তির ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। তারাশঙ্করের 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তেও একই চিত্রের আভাস। প্রথম রচনায় সেবিকা দ্বিতীয়ে সেবিকা নয়, দেবী অর্থাৎ নাগিনীকন্যার নিজের জীবনও বাস্তবক্ষেত্রে খুব পবিত্র থাকে না—এমন ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে গণিকা, পতিতা, বেশ্যা, যা আজ সমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত পেশা, দেবী বা তাঁদের উপাসিকাদের ক্ষেত্রে সেই শব্দগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে কেন? এটি কি প্রথমাবধিই পেশা ছিল? না এর পেছনে অন্য কিছু কারণ ছিল?—

অসতার্ত, আক্রোদাইত অথবা দেবী যে নামেই থাকুন না কেন, সমকালীন সামাজিক নিয়ম অনুসারে সাইপ্রাসের সমস্ত কুমারীকেই বিবাহের পূর্বে বিদেশী অথবা অপরিচিতদের সঙ্গে যৌনমিলন ঘটাতে হতো, তাঁর মন্দিরে। একই নিয়ম পশ্চিম এশিয়ার বহু জায়গাতেই ছিল। আর যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, এটা কোন ব্যভিচার বা যৌন কামনার পরিতৃপ্তি নয়. এটা ছিল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামের দেবীপূজার অঙ্গ। এমনিভাবে ব্যবিলনে দেবী গিলিত্তা বা ইসতার অসতার্ত-এর মন্দিরে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত নারীকেই বিদেশীর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে হত। আর এই 'পবিত্র' গণিকাবৃত্তিতে যে অর্থ উপার্জিত হত, তা যেত দেবমন্দিরে, দেবমন্দির অপেক্ষমান নারীকুলের দ্বারা সর্বদাই পূর্ণ থাকত। ক্ষেত্রবিশেষে কুমারীকে বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে হত। সিরিয়ার হেলিওপোলিস অথবা ব্যালবেকও কুমারীকন্যাদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযুক্ত ছিল। মন্দিরের পূজারিণী এবং কুমারী-কন্যাদের এমনি করেই দেবীভক্তির পরীক্ষা দিতে হত।

সম্রাট কনস্টেনটাইন এই নিয়ম রদ করে মন্দির ভেঙে দেন। ফিনিশিয় মন্দির গুলিতে মেয়েরা গণিকার কাজকে বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করত। কারণ, তারা মনে করত, এতে দেবী সন্তুষ্ট হবেন। এবং ভক্তকে অনুগ্রহ করবেন। আমারাইটদের মধ্যে নিয়মই ছিল, কোনো মেয়ের বিবাহসম্বন্ধে পাকা হলে তাকে মন্দিরের সামনে দেহ দানের জন্য অবশ্যই সাতদিন বসে থাকতে হবে।

বিবলাস-এ এডোনিশের বার্ষিক শোকপ্রকাশের সময় সবাইকে মাথা ন্যাড়া করতে হত। কোনো নারী তা না করতে চাইলে শোকোৎসবের এক নির্দিষ্ট দিনে

অপরিচিত কোনো লোককে দেহ দান করতে হত। বিনিময়ে অর্জিত অর্থ দেবী মন্দিরে যেত। লিডিয়ার ট্রলেস-এ প্রাপ্ত গ্রীক 'লেখ'তে দেখা যায় যে এ নিয়ম খ্রীস্টীয় ২য় শতকেও ছিল। দেবতার প্রত্যাদেশে অরোলয়া এ্যামিলিয়া, তার মা এবং পরিবারের পূর্ববর্তিনী নারীরা সবাই এটা করেছে। আর্মেনীয়ার অ্যাসিলিসেনাতে এনাইতিসের মন্দিরে বিয়ের বহু আগে থেকেই মেয়েরা এই পবিত্র গণিকাবৃত্তি করত। নির্দিষ্ট সময় ধরে এটা না করলে তাদের বিয়ে হোতো না। পনতুসের কোমানোতে 'মা'-এর মন্দিরেও একই বিধি।[১৭৪]

আমাদের দেশে দেবতার 'দোর ধরে' সন্তান পাওয়ার কথা এখনও মেয়েরা বলেন ; যদিও উল্লিখিত দিকগুলি আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে দেব/দেবী মন্দিরে 'হত্যা' আজও প্রচলিত। 'হত্যা' শব্দটির অর্থ কি, তার আলোচনা আগেই করবার চেষ্টা করেছি।

পশ্চিম এশিয়ার এইসব দেব দেবী এবং তাদের পূজারিণী তথা কুমারী কন্যা-কুলের বারবণিতা-আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফ্রেজার বলেছেন যে, এইসব দেবী সম্পর্কিত কাহিনী পড়লে দেখা যায় যে এঁরা অধিকাংশই স্বামী পুত্র বা অন্য কাউকে দয়িতহিসাবে গ্রহণ করেছেন। সমকালীন সমাজ রীতিনীতি অনুসারে, দূষণীয় ছিল না। তাই প্রাক্ বিবাহিত জীবনে কুমারীকুলের বারবণিতা সুলভ আচরণও তাই নিন্দনীয় না হয়ে তা ছিল পবিত্র ব্রত।

আমরা দুর্গাকে শিবগৃহিনী হিসাবেই জানি। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ যখন দুর্গাকে 'কৌমারী শিখিবাহনা' বিশেষণে ভূষিত করেন, তখন কিন্তু তাঁকে কুমার কার্তিকেয়, যিনি পুত্র রূপে কল্পিত, তারই শক্তি বলে মনে হয়, তা ছাড়া শিখিবাহনা বললেও সে কার্তিকেয়-শক্তিকেই মনে পড়ে। একথা একটু আগেই বলেছি।

এছাড়া, বর্তমানে উচ্চ কোটিতে স্থান পেলেও একসময় তিনি ছিলেন শবরদের পূজিত দেবী। তখনকার আচার আচরণ যা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায় তাতে বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকাকে প্রচলিত ব্যাখ্যায় গ্রহণ করতে প্রশ্ন জাগে না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে গণিকা শব্দের মূলে যে গণ মিলনের ইঙ্গিত আছে তা ভারতের বিভিন্ন পূজাপদ্ধতিতে যে এক সময় ছিল তার একাধিক ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ আছে। তার বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বারবণিতা, গণিকা, বেশ্যা শব্দগুলি যে অনুষঙ্গে ব্যবহৃত, সুপ্রাচীন এইসব মন্দির-

১৭৪. The Golden Bough, pp. 435-36.

কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান থেকে শব্দগুলি প্রথম যুগে উৎপন্ন। পরবর্তীকালে রাজা বা বর্ধিষ্ণু ভূস্বামীদের লালসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যখন ভিন্নতর সমাজের পরিবেশে পদস্খলিত নারীর জীবন ও জীবিকা এর সঙ্গে যুক্ত হল তখনই শব্দগুলির অর্থানুষঙ্গ পরিবর্তিত হল। সমস্ত ব্যাপারটাই, বোঝার ব্যাপারে, অস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

দেবদাসী নয়, আমাদের দেশের মন্দিরে কুমারী পুজারিণীর সাহিত্যিক উদাহরণ দিয়েছি নাগিনীকন্যার কাহিনী এবং শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা উপন্যাস থেকে। এবার উপন্যাস নয়, দক্ষিণভারতে সামাজিক চিত্র থেকে—

কোচিনের অন্তর্গত ক্র্যাঙ্গানোর একটি ছোট্ট সমুদ্রবন্দর। এখানে আছে একটি কালীমন্দির। এখানে দেবীপূজার বাৎসরিক বড় উৎসব 'ভরণী'। এই উৎসবে বিভিন্ন জায়গা থেকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী এবং গান গাইতে গাইতে আসে ভক্তরা। পথে মেয়েদের দেখলে অশ্লীলতা আরও বেড়ে যায়। উৎসবের দিনে মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য মোরগ বলি হয়। প্রসাদ বিতরণ করে মেয়েরা।

The work of doling it (manjal prasadam) out is done by young maidens who are also duing the process subjected to ceaseless volleys of vile and vulgar abuse. With surely stoical endurance they submit to attend to their work.[১৭৫]

দেবমন্দিরের পূজারিণী কুমারীকন্যাদের প্রতি অপরিচিত দেবী-ভক্তদের কেন এই আচরণ। এর সঙ্গে কি পশ্চিম এশিয়ার মন্দিরে কুমারীদের আচরণের সাদৃশ্য নেই?

আফ্রিকার যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাজজীবন-চিত্র সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই তাদের একটি গোষ্ঠী 'চিতা' (লেপার্ড)-র মধ্যেও ঠিক নাগিনীকন্যার মত 'বাঘিনী-কন্যা' রয়েছে। এই 'বাঘিনীকন্যা' ও একটি বিশেষ দিনে প্রতাকিত-গণমিলনে বাধ্য হয়।

বিষ তৈরি হবার আগের দিন। ওপোকু (নায়ক) এবং আর যারা বিষ মেশাবার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে সবাই বনের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওনা হয়ে যায়। তিনটি নারী যায় এ দলে—আমালাগানে (বাঘিনীকন্যা, কাহিনীর নায়িকা), সন্তান ধারণের বয়স পার হয়ে যাওয়া এক বুড়ি, আর একটি তরুণী, যে নতুন বাঘিনীকন্যা হবে।

জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিষ্কার করা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে।

১৭৫. T. k. Gopal pannikar; Malabar and Its Folk, Madras 1900 p 109

…কোনো মতে খানকয়েক পাতার কুঁড়ে বাঁধা হয়েছে, মেয়ে এবং পুরুষের জন্য আলাদা করে। নির্বাক এবং উপবাসী থাকতে হবে সবাইকে—এই নিয়ম।
স্ট্রোপান্থাসের ছড়া গুঁড়ো করার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থেকেছে মেয়েরা। শী-গাছ থেকে মাখন বানিয়েছে। ঠিক করেছে সাপের বিষ। আর আর যা কিছু মেশানো হবে বিষের সঙ্গে তাও জোগাড় করেছে তারা।
মেয়েদের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ রাখেনি মরদরা। রাতের আগ পর্যন্ত সময় কেটেছে তীর বানিয়ে, ধনুক বেঁধে। তূণও বানিয়েছে। অনুষ্ঠানের আগে মেয়ে পুরুষকে একেবারে আলাদা থাকতে হয়। সংযম-রক্ষার জন্যই এই বিধান।
যে পেণ্টিয়া মন্দিরের সেবাইত এবং পূজারিণীর পদ থেকে আমালাগানে আজ অবসর গ্রহণ করবে, তা আর কিছু নয়, প্রধানত স্ট্রোপান্থাস দিয়ে তৈরি পাঁচমিশেলী বিষের আধার, কালো মাটির একটা হাঁড়ি।…
অধিকাংশ দেও-দানার মত স্ট্রোপান্থাসের দেবতারও নিজস্ব মন্দির আছে। তারই নাম পেণ্টিয়া। আর তার সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকে একজন পুরোহিত। …যে মহাশক্তিধর দেবতা, তার দাবি যে, পূজানুষ্ঠানের সময় তার সেবায়েৎরা অপবিত্র অবস্থায় কেউ আসতে পারবে না। আর পূজারিণী যে সে-ও হবে খাঁটি কুমারী। সমস্ত গোষ্ঠীর জীয়নকাঠি ও মরণকাঠি যে বিষাক্ত তীর, চিতাবাঘ-সমাজ তার অনুগ্রহ লাভ করবে যার মারফতে, অক্ষত কুমারীত্বই হবে তার সাধনা। তাই সে হলো সমাজের বাঘিনীকন্যা।…অবশেষে রাত নামে।…
মাঝরাতে হঠাৎ খরর্ খরর্ করে মোটা কাঠের খঞ্জনি গর্জন করে ওঠে। এই যন্ত্রকে ওরা বলে হায়েনার ফেউ। ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে তা প্রতিধ্বনি তোলে। কোন-মতে বাঁধা ঘেসো কুঁড়েগুলির বেড়ার ফাঁক দিয়ে চকিতে ঠিকরে পড়ে আলো। তারপর নিঃশব্দে স্থির পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়ে পুরুষের দল। বাইরে এসে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে যায়।…

একটা লোক বেরিয়ে আসে একটা জলন্ত লাকড়ি নিয়ে। তারপর সেইটে থেকে বাইরের স্তূপাকার করে সাজানো কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুনের চোখ ঝলসানো দীপ্তির মধ্যে দেখা যায় ছায়ার মত দণ্ডায়মান পূজারিণী আমলাগানের দীর্ঘ ঋজুদেহ, সম্পূর্ণ আবরণহীন। পাতার আচ্ছাদন, কোমরে দড়ি, ধাতুর তৈরী অলংকার—সব কিছু বিদূরিত হয়েছে তার দেহ থেকে। বুড়ি বসে আছে ঠিক ওর পেছনে, মাটির উপর। হাঁড়ি-মন্দিরটা দু'ঠ্যাং-এর ফাঁকে নিয়ে বসে আছে। আর তারই পাশে বসে আছে বছর বারোর একটি

মেয়ে।…একটা স্ট্রোপান্থাসের ডাল হাতে নিয়ে বসে আছে নবনির্বাচিত সেবায়েত, সে হবে নতুন বাঘিনীকন্যা।

হঠাৎ একজন লোক দলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অদৃশ্য মৃত আত্মাদের প্রতি আহ্বান জানায়: 'এই তীরগুলি তোরা যেমন বানাতিস, মোরাও তেমনি করে বানাতে চাই। তারপর জীবিতদের দিকে ফিরে তাকিয়ে তাদের সম্বোধন করে বলে:

যদি কেউ থাকিস যে কখনো চুরি করিস,
যদি কেউ থাকিস যে পরের বউ নিয়ে ভোগ করিস,
যদি কেউ থাকিস লোভী,
যদি কেউ পড়শীর ক্ষতি হওয়া ইচ্ছে করিস,—এমন যারা আছে
তাদের বিষ না-মাখানো তীর দিয়ে
এখনি প্রাণ আগুনে সেঁকে দিক।

এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার তূণের গায়ে তীরের ঘটর ঘটর শব্দ শোনা যায়। সবাই চেনে বাঁ কাঁধে তীরের গোছা। রূপসী (নাম বাগানে-শব্দটির অর্থই রূপসী) বাহুযুগল প্রসারিত করে দেয়।

সারি থেকে প্রথম লোক ছুটে বেরোয়, ফলাগুলো সোজা করে তীরের গোছাটা সামনের দিকে এগিয়ে ধরে। পূজারিণী গ্রহণ করে সেগুলো। তারপর গুছিয়ে নিয়ে অল্প ফাঁক করা দুপায়ের মাঝখান দিয়ে। ছুঁয়ে বুড়ির কাছে তা চালান করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি তীক্ষ্ণ ফলাগুলি ডুবিয়ে দেয় হাঁড়ির মধ্যে। একমুহূর্তের জন্য পুরুষটি পূজারিণীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়। তারপর যেমনভাবে দিয়েছিল তীরগুলি, ঠিক তেমনিভাবে তা ফিরে আসে। মারাত্মক বিষে সদ্যসিক্ত তীরের ফলাগুলি রূপসীর ঊরু পা চুম্বন করে চলে। তীরগুলি বুকের উপর চেপে ধরে পূজারিণী, তারপর দু'হাতে ধরে পুরুষটির হাতে এগিয়ে দেয়। অঞ্জলি পেতে শ্রদ্ধার সঙ্গে তীরের গোছা গ্রহণ করে সরে যায় পুরুষটি।[১৬]

বাঘিনীকন্যা সম্প্রদায়ের দেখা এই 'আনুষ্ঠানিক আলিঙ্গন'-কে কি নামে অভিহিত করা যাবে? এতো কুমারীর ধর্ষণ। এতো একধরণের গোষ্ঠিমিলন একটি যুবতীর সঙ্গে যার তত্ত্ব এখন ধরেছি আগেই (দ্র. ১৯-২০ পৃষ্ঠার নিউগিনির যৌবন-দীক্ষা অনুষ্ঠান)। গণরতির নিবেদিতা কি আদিম অর্থে গণিকা?

---

১৬ বাঘিনীকন্যা: পবিত্র সরকার ও রাখাল ভট্টাচার্য। কলকাতা ১৯৬০। পৃ. ৬৬-৬৯।

অবমাননা, লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়েছে। দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর বিভিন্ন দেবতার ঔরসে পুত্রলাভের কাহিনী এই অবমাননারই কথা। পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ প্রকৃত প্রস্তাবে যে পুরুষের নিয়োগ প্রথারই নামান্তর তার একটি চিত্র তুলে ধরছি 'ঝিন্দের বন্দী' গ্রন্থ থেকে।—

কেবল একটি বিষয়ে রাজা এবং প্রজারা একটু নিরানন্দ—পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত রাজার বংশধর জন্মগ্রহণ করল না। রাজার তিন রানী। তিনজনেই নিঃসন্তান।

রাজা হোম যজ্ঞ দৈবকার্য অনেক করলেন। কিছুতেই কিছু ফল হলো না। ...রাজগুরু অনেক চিন্তার পর বললেন, 'একটিমাত্র উপায় আছে।...ধনঞ্জয় বলিলেন—'প্রাচীনকালে নিয়োগ প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল জানেন?' স্তম্ভিত হইয়া গৌরী বলিল—'জানি—'।

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন, 'ঝিন্দে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি নেই, কিন্তু অবস্থাবিশেষে নিয়োগ প্রথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। রাজবংশেই প্রায় দু'শ বছর আগে ঐ রকম ব্যাপার করতে হয়েছিল।' গুরু নজির দেখিয়ে রাজাকে সেই পথ অবলম্বন করতে বললেন; উপদেশ দিলেন।

'ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছেন।'

অস্ফুটস্বরে গৌরী বলিল—কালীশংকর—?

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িলেন—'প্রকাশ্যে এক মহাপুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ···যজ্ঞটিকা পরলেন রায় দেওয়ান কালীশংকর। রাজগুরু আর কালীশংকর ছাড়া একথা আর কেউ জানেনা। এমনকি রানী পর্যন্ত না। সেকালে অনেকরকম ওষুধ ছিল। যা হোক, যথাসময়ে পাটরানী 'পদ্মা' এক কুমার প্রসব করলেন।' ১৭৯

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের মূল ক্রিয়াকলাপ থাকে যবনিকার অন্তরালে। মহাভারতের 'চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায়'—'প্রাচীন রাজ্য সংস্থান'-এ এই রীতির প্রকাশ্য স্বীকৃতি আছে। ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্তে কুমারীকন্যার কুমারীত্ব, নারীত্ব রক্ষার আকুল আবেদন-ও বিফল হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের জন্মবৃত্তান্ত-ও তাই-ই। অতীতের এইসব কাহিনীতে এ ব্যাপারে মূলত ব্রাহ্মণের অধিকারকে মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

১৭৯. শরদিন্দু অমনিবাস, নবম খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮০, পৃ. ৮১-৮২।

প্রাচীন এইসব কাহিনীর ঐতিহ্যকে পটভূমিতে রেখে আধুনিক কালের দিকে তাকালেও নারী-লাঞ্ছনার নানাবিধ চিত্র পাওয়া যায়।

গুণা (মধ্যপ্রদেশ), ১ মারচ—এখান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ঝাগর গ্রামে এক হরিজন মহিলার নাক কেটে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি তিনি এক বর্ণহিন্দুকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[১৮০]

জগদলপুর (বস্তার), ১৬ই মার্চ—সম্প্রতি এখানকার মুরিয়া উপজাতির একটি লোক তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে মিশনারী হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই হাসপাতালেরই দুজন নার্স ইতিপূর্বে তাদের গ্রামে গিয়ে মেয়েটিকে পরীক্ষা করে বলেছিল, গর্ভে যমজ সন্তান আছে এবং একটি মৃত। সেটিকে অপারেশন করে ফেলে না দিলে মেয়েটি হয়তো মারা পড়বে। সেই উদ্দেশ্যেই স্বামী তাকে নিয়ে যাচ্ছিল হাসপাতালে। পথে দৈবাৎ তার সঙ্গে গ্রামেরই সাতজন মুরিয়ার দেখা হয়। খবরাখবর জানার পর তারা বলে সর্বনাশ। তা হলে তো ওর পেটেই মরা বাচ্চাটা ভূত হয়ে গেছে। সে তোমাকে শিগগির মেরে ফেলবে। তার আগে তুমি ভূতটা পেটে থাকতে থাকতেই মেরে ফেলো। বউকে আগুনে পুড়িয়ে মারলে ভূতটা পুড়ে মরবে। এরপর লোকটা তা-ই করেছে বউকে পুড়িয়ে মেরেছে। হতভাগিনীর আর্তনাদে কেউ সাড়া দেয়নি।[১৮১]

সমাজ-সংস্কারের কাছে, ভূতের অথবা প্রেতাত্মার কাছে নারী তথা কুমারী বা গর্ভবতীর বলির একাধিক ঘটনার উল্লেখ আগেই করেছি। কিন্তু ভূতের ভয়ের কাছে নিজের স্ত্রীকে উৎসর্গ করার উল্লিখিত কাহিনীটি বিরল দৃষ্টান্ত।

অর্থাৎ দেশ-বিদেশের ধর্ম তথা সমাজ-সংস্কারের কাছে অত্যন্ত অসহায়ভাবে এইসব নারীকুল যুগে যুগে নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ তৈরী অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। তবুও, পৌরোহিত্য-তন্ত্রের উত্তরসূরি আজকের যুগের ধর্ম-সংস্কারকগণ এখনও আতংকিত হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে কুমারীদের প্রেতাত্মারা জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। জিহোবার উদ্দেশ্যে কুমারীবলির বাইবেলের ঘটনার উল্লেখ, ক্রাইদের কুমারীবলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। •সেই

১৮০. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ মার্চ ১৯৮১

১৮১. ঐ, ১৭ মার্চ ১৯৮০।

বলিপ্রদত্ত কুমারীদের ক্ষুব্ধ প্রেত-আত্মারা সম্প্রতিকালে একটি গীর্জাকে বন্ধ করার ঘোষণা করাতে বাধ্য করেছে।[১৮২]

যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হলো এর সবগুলোই মানুষের পশু-প্রবৃত্তির কাছে নারীত্বের, কুমারীর কুমারীত্বের বলি। এদের বলি দেওয়া হয়েছে কখনও পশুত্বের কাছে, কখনও-দেব-দেবীর কাছে।

দেববাদের ক্রমবিবর্তনের ধারা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এই বিবর্তনের ধারার সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলেছে তান্ত্রিক দেবীরাও। আজকের তান্ত্রিক দেবীরা মানবী-রূপিনী। কিন্তু এদেরও বিবর্তন ঘটেছে।

তন্ত্রে ষট্‌চক্রভেদে ষড়াধারের ছ'টি অধিষ্ঠাত্রী দেবী কল্পিত হয়েছেন। মূলাধারচক্রে ডাকিনী। অন্যান্য চক্রে যথাক্রমে রাকিনী লাকিনী কাকিনী শাকিনী এবং হাকিনীর অবস্থান।[১৮৩]

অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা সকলেই প্রায় মানবেতর প্রাণী। ডাকিনী হচ্ছেন সর্পবদনা। উলুক বা প্যাঁচামুখী রাকিনীদেবী। লাকিনীকে বলা হয়েছে 'শ্রীকপালাঢ্যা'। কাকিনীর মুখ ঘোড়ার মুখের মত, তার তিনদিকে তিনটি মুখ। মার্জারবদনা দেবী শাকিনী। হাকিনী ঋক্ষবদনা।[১৮৪]

---

১৮২. The Statesman, Calcutta 21 December 1980.

Eton, Dec. 20 - St. John's Anglican church here would be closed on New Year's Day because it is haunted by demons and ghosts of sacrificed virgins, the Vicar announced yesterday, reports A. F. P.

The Bishop of Oxford sent an expert to exorcise the church, but evil spirits continued to light candles cause prayer books to crumble and fires to breakout around the alter and among the pews, said the Reverned Christopher Johnson.

The diagnosis of the exorcist was that the church was built on a site where pagans once worshipped the devil and sacrificed virgins to him.

১৮৩. Arthur Avalon : The Serpent Power Calcutta 1924, P. 120.

১৮৪. কুলার্ণবতন্ত্র ১০।১৭৮-১৮৩।

ডাকিনী সর্পবদনা বিভুজা জ্বলনপ্রভা।
কমণ্ডলুং কর্তৃকাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপদা॥
উলূকবদনা দেবী রাকিনী নীলসন্নিভা।
খড়্গ-খেটক-সংযুক্তা সর্বালংকারভূষিতা॥
লাকিনী শ্রীকপালাঢ্যা পাশাঙ্কুশধরা সতী।
পাটলীপুষ্পসংকাশা সর্বাভরণভূষিতা॥

তান্ত্রিকদেবীরা গোত্রদেবী। 'গোত্র' শব্দের অর্থ কুল বা বংশ। তন্ত্রসাধনার কুলাগার অর্থাৎ গোত্র শব্দের অর্থ যোনি। মূলে এই কুলাগারের পূজাই ছিল তান্ত্রিক পূজা। জ্ঞানার্ণব ইত্যাদির মতে যে কুমারী-পূজা তা বিশুদ্ধ এবং দিব্যভাবাপন্ন, এ পূজা পরবর্তীকালের। কিন্তু বীরাচারী সাধকদের কুমারীপূজা কিছুটা অন্য ধরনের। যে আক্ষরিক অর্থে এককালে বহির্বিশ্বে বা ভারতে কুমারীবলি প্রচলিত ছিল (লুকিয়ে-চুরিয়ে এখনও দু'একটি ঘটে), এখানে তা নয়। তন্ত্রমতে কুমারীবলির অর্থ 'কুমারীত্বের বল' বা কুমারীত্বের উপহার, ছেদন বা ভেদ; এরই ফলে সৃষ্টির সম্ভাবনা। তন্ত্রমতে পশুবলি যেখানে পশুত্বের ছেদনের সাহায্যে বীরাচারী সাধনায় উত্তরণ এবং বীরাচারী সাধনা অর্থে যামল বা সামরস্যের সাধনা, লতাসাধনা বা কায়াসাধনা (কমলকুলিশ যোগ), নাথপন্থীদের 'চন্দ্রসূর্যমেলন' অথবা বৈষ্ণব সহজিয়াদের 'রসরতিযোগ' ইত্যাদি, তেমনি কুমারীবলির অর্থও এই যুগ্মভাব সাধনা, সৃষ্টিক্রিয়ার সাধনা।

এই যুগ্মভাব সাধনার জন্য দেব ও দেবীদের অভেদ কল্পনা বেদ এবং তন্ত্র—উভয় ক্ষেত্রেই লভ্য। বেদে 'দ্যাবাপৃথিবী'কে পিতা এবং মাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে।

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।

উত্তানয়োশ্চম্বোর্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ॥ ঋ, ১।১৬৪।৩৩॥

দ্যৌঃ বা আকাশ ইন্দ্ররূপী এবং পৃথিবী মাতৃরূপিনী। শৈবপুরাণেও এই জাতীয় চিন্তা স্থান পেয়েছে।—'আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।' কালিকাপুরাণে দেবীর মূর্তি জগদ্ধাত্রীরূপে জনকরাজার কাছে স্ফুরিত হয়েছিল (৩৭।২৮)।

গন্ধর্বতন্ত্রে বলা হয়েছে, সোম বা চন্দ্র শক্তিস্বরূপা, শিব হলেন সূর্য, 'সোম শক্তিঃ শিবঃ সূর্যো নিশাশক্তির্দিবাশিবঃ' (২২।৭১)। শিব সূর্যস্বরূপ এবং শক্তি সোমস্বরূপা। একই বক্তব্য আছে শারদাতিলকতন্ত্রে 'বিন্দুবিসর্গ'-এর কল্পনায়।

কাকিনী হৃৎবক্ষে চ মাণিক্যসদৃশপ্রভা।
ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদা সর্বশোভনা॥
শাকিনী ত্বগ্‌জনপ্রখ্যা মার্জারাস্যা সশোভনা।
কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা॥
হাকিনী শুক্লবদনা নীলনীরদসন্নিভা।
কপালশূলহস্তা চ খৈটকৈ রূপ শোভিতা॥

শিবশক্তির দ্বৈতরূপ মিলিত হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে রূপ নিল। 'হিন্দুসর্বস্ব' গ্রন্থে অর্ধনারীশ্বর শিবের পূজার ধ্যানমন্ত্র আছে। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে :

বহুধা চ পৃথক্ত্বেন তৌ রেমাতে নরেশ্বর।

অর্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন॥ ৪৫।১৮১

কুষাণ যুগের একটি অর্ধনারীশ্বরের মণ্ডনমূর্তি পাওয়া গেছে।[১৮৫] এখনও হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর মৃন্ময়ী মূর্তি বিভিন্ন মন্দিরে পূজিত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন দিক থেকে এদের অভেদত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে।

বৈদিক রুদ্রদেবী ও কালিকার পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। রুদ্র 'কৃষ্ণপিঙ্গলং', কালিকা কৃষ্ণবর্ণা। উভয়েরই দুটি করে রূপ উগ্র এবং সৌম্য। রুদ্র দস্যু-তস্করের দেবতা, কালিকাও তাই। রুদ্রের সঙ্গে জলের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, দেবীর সঙ্গেও জলের সম্পর্ক নিবিড়। বিভিন্ন দেবীস্থানে কুণ্ডের অবস্থান লক্ষণীয়।[১৮৬] রুদ্র কৃত্তিবাস, দেবীও ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা (দ্রঃ চামুণ্ডা কালীর উদ্ভব : মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। রুদ্র যোদ্ধা, দেবী ও তা-ই। রুদ্র 'তার' নামে অভিহিত, দেবীর অন্য নাম 'তারা'।

সংস্কৃত কাব্যে-পুরাণে শিব ও দেবীর অভিন্নত্ব কল্পিত হয়েছে। মহাভারতে শিবকে 'রক্তমাল্যাম্বরধর' (১২।২০৪.৭৬), পক্কান্নমাংসলুব্ধ (১২।২৮৪।২৬), দশবাহু (১২।২৮৪।২৪), অষ্টাদশভুজ (১৩।১৪।২৫০) বলা হয়েছে। এ সমস্তই দেবী কালিকা বা দুর্গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শিব ব্রহ্মচারী (৭।৭৮।৫৮), দেবী কৌমারী ব্রহ্মচারিণী (৪।৬।৭)। শিব অসুরঘ্ন (১৩।১৪।২৪) এবং মহিষঘ্ন (১৩।১৪।৩১২), দেবীও অসুরনাশিনী, মহিষমর্দিনী। শিব শ্মশানবাসী (১০।৭।৪), দেবীর শ্মশানকালীরূপ সর্বজনবিদিত।

শৈবরা শিব ও শক্তির ভেদ স্বীকার করেন না। 'শক্তিশক্তির্মতোর্ভেদঃ শৈবে জাতু ন বর্ণ্যতে' (শিবদৃষ্টি ৩।৩)। একই মতে শিব শক্তিরহিত নন, শক্তিও শিবহীনা নন। শিবাদ্বৈতবাদীদের মতে শক্তিই শিবকে জানাবার উপায়— 'শক্তিরেব তজ্জ্ঞপ্তাবুপায়ঃ' (তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক, পৃঃ ২২৯)। গন্ধর্বতন্ত্রে

১৮৫. J. N. Bhattacharyya : Hindu Iconography, (2nd ed) 1956, p. 182.

১৮৬. এই কুণ্ডের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে শ্রীবাণীকান্ত কাকতি রচিত The Mother Goddess Kamakhya গ্রন্থে।

চেতনাচেতন জগৎকে শিবশক্তিময় বলে উল্লিখিত। এই তন্ত্রমতেই এঁরা অভেদ।

তন্ত্রগ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : 'মহাকালী মহাকালশ্চনকাকার রূপতঃ। মায়য়াচ্ছাদিতানাং তন্মধ্যে সমাভাগতঃ'। অর্থাৎ মহাকালী এবং মহাকাল চনকাকারে অবস্থিত। চনকের যেমন উপরিভাগে আবরণ এবং অভ্যন্তর সমভাগে বিভক্ত পরস্পর আশ্লিষ্ট দ্বিদল, পরব্রহ্মতত্ত্বও তদ্রূপ বহির্ভাগে মায়ায় আবৃত এবং অভ্যন্তরে শিবশক্তিরূপে সমভাগে উভয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট।

তন্ত্রে দেবদেবীর রূপ অবিনাবদ্ধ রূপেই প্রদর্শিত।[১৮৭]

ঋগ্‌বেদে যজ্ঞবেদীকে যোনি বলা হয়েছে। ১।১০৪।১ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য বলেছেন : 'যোনিঃ স্থানম্'। শিব বা রুদ্র এর উপরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। প্রত্যক্ষত ক্রিয়াত্মক সাধনার ক্ষেত্রেও দেবদেবীর মিলিত রূপই ব্যক্ত। হিন্দু অথবা বৌদ্ধ—উভয় তন্ত্রেই দেবদেবীর মিথুন মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। দেবী কালিকার ধ্যানে 'মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্', 'শ্মশানস্থে তন্ত্রে মহাকাল সুরতপ্রসক্তে' ইত্যাদি রূপ বর্ণিত (দ্র. তন্ত্রসার)। মূলে বৌদ্ধদেবী 'তারা'ও ঋষি অক্ষোভ্যের সঙ্গে অবস্থান করছেন ; যদিও মিথুনভাবে নয়। তান্ত্রিক হোমের পূর্বে যে ঋতুমতী বাগীশ্বরীর ধ্যান করা হয় তাতে 'বাগীশ্বরেণ সংযুক্তং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্' বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দেবদেবীরা প্রায়শই যুগনদ্ধ (yab yam) [তিব্বতী য়ব্ এবং য়ুম্ প্রজ্ঞা ও উপায়বোধক]। ১৭ সংখ্যক চর্যাপদের শেষে 'বুদ্ধনাটক বিসমাহোই'-এর মাধ্যমে বিপরীত রতির কথা বলা হয়েছে। নাহার সংগ্রহের হেবজ্র মূর্তি-ও যুগনদ্ধ। "অষ্টশির ষোড়শভুজ, কতগুলি মৃতশবের উপর প্রসারিত পদে দণ্ডায়মান যুগনদ্ধ হেবজ্র—এই অপূর্ব মূর্তিটিতে তাঁহার ক্রোড়স্থিত শক্তির (সম্ভবত বজ্রবারাহীর) নাকে নাক রাখিয়া উভয়ে উভয়ের দুই বাহুতে

১৮৭. লিঙ্গরূপো মহাকালঃ যোনিরূপাহি কালিকা / তয়োর্যোগ পরাধন্যা তয়োর্যোগ পরো মহান্।—নিরুত্তরতন্ত্র, ১৪ পটল।

যত্র লিঙ্গস্তত্র যোনির্যত্র যোনিস্তত্র শিবঃ।—প্রাণতোষিণীতন্ত্রে উদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্র বচন।

যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গঞ্চ জনকং পিতা।

মাতৃভাবং পিতৃভাবমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।—প্রাণতোষিণীধৃত নিরুত্তর তন্ত্রবচন।

লিঙ্গপুরাণের শিবলিঙ্গের ব্যাখ্যায়—

পীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শঙ্করঃ।

প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পূজয়ন্তি সুরাসুরাঃ ॥—লিঙ্গপুরাণ, উত্তরভাগ, ১১।৩১।

দৃঢ়ালিঙ্গনবদ্ধ (yab yam)"।[১৮৮] নাকে নাক রাখা এক বিশেষ ধরণের চুম্বনরীতি।[১৮৯]

এ সমস্তই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ধর্মীয় উপাসনা। বৈদিক যুগের আদিতে-ও লভ্য। বৈদিক যুগের বহু আগে থেকেই প্রাকৃত 'জন'-দের মধ্যে এগুলি প্রচলিত ছিল। এখনও তান্ত্রিক উপাসনা এবং সাধনার মধ্যে এগুলি লক্ষ্য করা যায়। লোকায়ত সাধনগুলিতেও তন্ত্রের এই আচারই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আছে। বহির্বিশ্বেও যে এগুলি এককালে ব্যাপক ছিল তার উদাহরণ কিছু দিয়েছি (বিস্তৃত আলোচনার জন্য Sex and Sexworship : O. A. Wall-দ্রষ্টব্য)। নাথপন্থীদের 'চন্দ্রসূর্য-মেলন' (দ্রষ্টব্য ড. কল্যাণী মৌলিকের গ্রন্থ), বৈষ্ণবসহজিয়াদের 'রসরতিযোগ' (দ্র. Obscure Religious Cults : Dr. Sashibhusan Dasgupta), বাজমার্গী বাউলদের বিন্দুপান উৎসব বৈষ্ণব পরকীয়া প্রেম, মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানদের Bride of Christ সম্প্রদায়, বাইবেলে Psalms, Songs of Solomon, গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানে অথবা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কায়াসাধনার কথা মূলত এই ধরণের সাধন-পদ্ধতিজাত।

তন্ত্রগ্রন্থে বীরাচারী সাধনায় পঞ্চ 'ম'-কার মুখ্যকল্প। ভৈরবীচক্র, দূতীযাগ, লতা-সাধনা, বীরপুরশ্চরণ ইত্যাদিতে 'মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ' অপরিহার্য। এই কৌলাচারই শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং 'কৌলাৎ পরতরং ন হি'। এই সাধনার প্রত্যক্ষ ক্রিয়া বিষয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'বৃহৎতন্ত্রসার'-এ কিছু আভাষ আছে মাত্র। কুলার্ণবতন্ত্রেও সামান্য কিছু বলা আছে; বাকী সমস্তই গুরুমুখী জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া গোচর।

১৮৮. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত : বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম কলিকাতা ১৩৬৫ প. ১৪৩।

১৮৯. The Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend See *Kiss*.

The "Savage" Kiss, also referred to as the olfactory or Malay Kiss or rubbing noses, is reported as common among the Maoris society and Sandwich Ilanders, Tongans, Eskimos. Descriptions are not in complete agreement though generally the kiss involves bringing the noses together and rubbing them. In southeast India the mouth and nose are applied to the cheek and the active partner inhales. Another observer has reported that the Yakuts, various Mongolian peoples and Lapps of Europe have a ritual : the nose is pressed against the cheek, a nasal inspiration follows, eyelids are lowered and lips a ersmacked.

তন্ত্রে মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলা হয়েছে। মানবদেহের বিভিন্ন বৃত্তির উৎকর্ষে সাধনাই বীর ও দিব্যভাবের সাধনা। সহজিয়া বৌদ্ধদের সহজ সাধনা এবং কায়াসাধনাও মূলত এক। তন্ত্রে দেহস্থিত দুই নাড়ী—ইড়া পিঙ্গলা বা দক্ষিণগাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। শূন্যতা করুণা প্রজ্ঞা উপায় বিন্দু নাদ গ্রাহক-গ্রাহ্য বজ্র-পদ্ম কমল-কুলিশ আলি কালি গঙ্গা-যমুনা চন্দ্র-সূর্য রাত্রি-দিবা ধমন-চমন ললনা-রসনা ইত্যাদি একই বস্তু।[১৯০]

নাড়ীদ্বয়কে তন্ত্র ব্যাখ্যায় শিবশক্তি এবং প্রজ্ঞা-উপায়রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে সাধন-প্রক্রিয়ায় এদের পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই রূপে দেখানো হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে এ সাধনা যুগনদ্ধভাবে সাধনা। হেবজ্রতন্ত্রে স্ত্রীলোককে প্রজ্ঞা এবং পুরুষকে উপায় বলা হয়েছে।—'যোষিৎ প্রাণং ভবেৎ প্রজ্ঞা উপায়ঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ'। তান্ত্রিক সাধন-প্রক্রিয়ায় সাধনসঙ্গিনীরূপে গৃহীতা সুন্দরী ষোড়শী তরুণীকে 'প্রজ্ঞা' নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১৯১] কালবীর চণ্ডরোষণতন্ত্রেও একই মতের প্রতিধ্বনি :—'নরাঃ বজ্রধরাকারা যোষিতঃ বজ্রযোষিতঃ।' জ্ঞানাবলী বজ্রমালাতন্ত্রে বলা হয়েছে, সব স্ত্রীলোকের দেহেই প্রজ্ঞা বা দেবীর এবং প্রভুর অধিষ্ঠান সব পুরুষের দেহে।—'সর্বনারী-মায়াদেবী সর্বোপায়ময়ঃ প্রভুঃ।'

প্রজ্ঞা এবং উপায়কে যোনি এবং লিঙ্গরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। কমল এবং কুলিশ একই বস্তু। কমল অর্থে যোনিপদ্ম এবং কুলিশ অর্থে লিঙ্গ :—'স্ত্রীন্দ্রিয়ং চ যথা পদ্মং বজ্রং পুংসেন্দ্রিয়ন্তথা (জ্ঞানসিদ্ধিঃ ৫ম অধ্যায়, ১১)। দোহাটীকায় (১২৫ পৃ) বলা হয়েছে : 'বজ্রপদ্মযোগেন তেজোধাতুঃ সংপদ্যতে।'

যোনিই সুখের আকর বলে প্রজ্ঞাকে যোনিস্বরূপ বলা হয়েছে, কারণ মহাসুখের বাসস্থান সেখানে।[১৯২] যেহেতু দেহ-মিলনের মাধ্যমেই পরম-সত্তার অনুভূতিলাভ সত্তাসাধনার উদ্দেশ্য, সহজিয়া সাধকেরাও তাই সাধনসঙ্গিনী বা প্রজ্ঞার সঙ্গে যুগনদ্ধ অবস্থায় উৎপন্ন বোধিচিত্তকে পারমার্থিক রূপে পরিবর্তিত করে, তাকে ঊর্ধ্বগা করে মহাসুখলাভে তৎপর হতেন। এখানে দেবতা নিজেকে সহজস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। স্ত্রীযোনি সুখাবতীতে তাঁর বাস শুক্র রূপে। এই সাধনা দেবতার ক্ষেত্রে যেমন, সাধকের

১৯০. এই প্রসঙ্গে হেবজ্রতন্ত্র, ষট্চক্রনিরূপণ-গ্রন্থে সঙ্গে উদ্ধৃত-বচন, (Ed Arthur Avalon) দেবেন্দ্র পরিপৃচ্ছ তন্ত্র (সুভাষিত সংগ্রহ) (Ed Bendell) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

১৯১. শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র, চতুর্থ পটল, পৃ. ১৯ [*Gaekow's Oriental Series*]

১৯২. যেন ক্লেশ ইপি নিহন্যতে/প্রজ্ঞাধীনাচ্চ তে ক্লেশসোধ্যবৎ প্রজ্ঞা ভগ উচ্যতে। হেবজ্রতন্ত্র।

ক্ষেত্রেও তেমনি :—'ভগে লিঙ্গম্ অধিষ্ঠাপ্য' বোধিচিত্তং নচোৎসৃজেৎ (পদ্মবজ্রের 'গুহ্যসিদ্ধি')।

প্রজ্ঞার বিভিন্ন তত্ত্ব বিচার করে তাঁকে জননী-ভগিনী-রজকী-রঞ্জনী-দুহিতা নর্তকী-ডোম্বী ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে (হেবজ্রতন্ত্র, পৃঃ ১৩ বি)। তন্ত্রের লতাসাধনেও ব্রাহ্মী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা বেশ্যা নাপিতকন্যা রজকী রঞ্জকী প্রভৃতি বৈদগ্ধ্যযুক্তা নারী (কুলচূড়ামণিতন্ত্র), এমনকি নটী কাপালিকা বেশ্যা পুক্কশী নাপিতকন্যা রজকী রঞ্জকী সৈরঙ্গ্রী ঘটিকা খটিকা গোপকন্যা (উত্তরতন্ত্র) এদের ব্যবহারও ছিল। কুমারীতন্ত্র নটী কাপালিকা বেশ্যা রজকী নাপিতকন্যা ব্রাহ্মী শূদ্রকন্যা গোপবালা এবং মালাকার কন্যাকে 'নবকন্যা' বলেছেন

চর্যাপদের বিভিন্ন পদে এই চিত্রের স্পষ্টরূপ মিলবে। তন্ত্রসাধনায় নির্দেশ আছে যে যেহেতু সম্বন্ধ নির্বিশেষে সমস্ত নারীই প্রজ্ঞা এবং নর উপায়ের প্রতিরূপ তাই সহজসাধনায় মাতা ভগিনী কন্যা বান্ধবী এবং স্পৃশ্যা-অস্পৃশ্যা নির্বিশেষে যে কোনো নারীই গ্রহণযোগ্য। কুলচূড়ামণিতন্ত্রের মতে নিজকন্যা, জ্যেষ্ঠা বা অনুজা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতা যে কেউই সাধনসঙ্গিনী হতে পারে।*

যে কোনো বর্ণের, যে কোনো শ্রেণীর, যে কোনো সম্পর্কের নারীকেই তন্ত্রসাধনায় 'প্রজ্ঞা' হিসাবে গ্রহণ করার বিধানের সঙ্গে তার 'ক্লেদ'-যুক্ত অবস্থাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। যেহেতু তন্ত্রসাধনায় পূজা অর্থেও সামরস্যের সাধনা, তাই রাত্রে মদ্য-মাংস ইত্যাদি সহযোগে রমন-বিধান আছে।[১৯৩]

ঋতুরজঃ প্রসঙ্গেই আসে পুষ্প বা ফুলের কথা। তন্ত্রে পুষ্প শব্দে স্ত্রীরজঃকে নির্দেশ করা হয়। পুষ্পিতা অর্থে ঋতুমতী এবং পুষ্পোৎসব হল নারীর প্রথম

* "মাতরং ভগিনীঞ্চৈব দুহিতাং বান্ধবীস্তথা।
ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াঞ্চৈব বৈশ্যাং শূদ্রিণীস্তথা।
নটীং রজকীং ডোম্বীং চ চণ্ডালিনীং তথা।
প্রজ্ঞোপায়বিধানেন পূজয়েৎ তত্ত্ববৎসলঃ।"—সম্পুটিকা পুঁথি পৃ ৩ক খ

অনুরূপভাবে হিন্দুতন্ত্রেও বলা হয়েছে—
"অন্যা যদি ন গচ্ছেত্তু নিজকন্যা নিজানুজা।
অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা বা তৎসপত্নীকা।
পূর্বাভাবে পরা পূজ্যা মদংশা যোষিতামতাঃ॥"—কুলচূড়ামণিতন্ত্র।

১৯৩. রাত্রৌ মাংসাসবৈর্দেবীং পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নো রমন্ ক্লেদযুতে হপি বা॥—মৎস্য তন্ত্র।

রজোদর্শনের উৎসব। যেহেতু গৌরীদান (অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা) ছিল এদেশের রীতি, তাই পুষ্পোৎসব বলতে এককালে একে দ্বিতীয় বিবাহ বোঝাতো।[১১৪] এই পুষ্পোৎসব পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জনগোষ্ঠীতে এককালে ব্যাপকভাবে ছিল, অঞ্চলবিশেষে আজও আছে।

লতাসাধনায় স্বয়ম্ভূ-পুষ্প, কুণ্ডপুষ্প এবং গোলপুষ্পের প্রয়োজন হয়। এই শব্দগুলি সবই পারিভাষিক। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে শিবশক্তি যোগ বা দেহমিলনগত সাধনায় এই পারিভাষিক পুষ্প ব্যবহারের কথা আছে।[১১৫] নব-পুষ্পের কথা পাই কুলার্ণবতন্ত্রে।[১১৬]

পরবর্তীকালের তান্ত্রিক চিন্তাধারায় যতই এই ধরণের ব্যাপার স্থান পেতে থাকলো, ততই নতুন নতুন ব্যাখ্যা এবং সংযোজন এলো। যেমন, বীরাচারী তান্ত্রিকদের দুর্গাপূজায় স্বয়ম্ভূ পুষ্প, সুগন্ধি পুষ্প-যুক্ত শুক্র, রক্তানন্দ-যুক্ত জবাফুল আলতা অপরিহার্য, অথবা কুমারীপূজার পরিবর্তে নবযৌবনা ন'টি নারীর পূজাও বিধিসম্মত। এদের নাম হৃল্লেখা গগনা রক্তা মহাতুণ্ডা করালিকা ইচ্ছা জ্ঞানা ক্রিয়া এবং দুর্গা। এগুলিও পারিভাষিক নাম।

ত্রিম্বকের ছ'টি কুমারী হত্যার নায়িকা কেবল এই পারিভাষিক পুষ্প আহরণের জন্য নিষ্পাপ প্রাণগুলি হরণ করেছিল। এই পুষ্প, পুষ্প-প্রস্ফুটনের কালকে কেবলমাত্র তন্ত্রসাধনা-ই নয়, পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীনতম চিন্তাধারাই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে কখনও এদের কৌমার্য হরণ করেছে, কখনও করেছে কণ্ঠ ছেদন। মূল লক্ষ্য ছিল সৃষ্টি। ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।

সমাজ ও কুমারী

দীর্ঘপথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে কুমারীবলির যে রেখাচিত্রটি তুলে ধরা গেল, তাতে

১১৪. লোকচারের বিস্তৃত বিবরণের জন্য—বিবাহের লোকাচার: দীনেন্দ্রকুমার সরকার দ্রষ্টব্য।

১১৫. শিবশক্তি সমাযোগো যোগো এব ন সংশয়ঃ।
আলিঙ্গনং কস্তুরী কর্পূরং চুম্বনং ভবেৎ।
নখদংষ্ট্র ক্ষতাদীনি পুষ্পানি বিবিধানি চ।
মৈথুনং তর্পণং সিদ্ধি বীজপাতো বিসর্জনম্॥

১১৬. আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনযোর্মর্দনং তথা। দর্শনস্পর্শনং যোনের্বিকাশো লিঙ্গঘর্ষণম্।
প্রবেশস্থাপনং শক্তের্নবপুষ্পানি পূজনে॥

একটা প্রশ্নই বারবার মনে আসে—কি পেয়েছে সমাজ এ জাতীয় চিন্তা বা অনুষ্ঠান থেকে?

মানুষের আদিম জীবনযাত্রায় যখন সে মানবেতর প্রাণীর মতই কেবল জৈব-জীবন যাপনে অভ্যস্ত তখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎকেই সে নির্বিচারে অনুকরণ এবং অনুসরণ করেছে। এই অনুকরণের যুগে সে মানবেতর প্রাণিকুলের আচার-আচরণকে অনুসরণ করেছে মূলত একটি দিকে লক্ষ্য রেখে—বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকতে হলে চাই বংশবৃদ্ধি। তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাকে দেখিয়ে দিয়েছে, যে প্রাণীরা তার চারপাশে নিরন্তর বংশবৃদ্ধি করে চলেছে তাদের মিলন হয় এক একটি বিশেষ ঋতুতে। মিলনের সংকেত স্ত্রী-পশুর ঋতুস্রাব। ঋতুরক্তের এক বিশেষ গন্ধ পুরুষ পশুকে টেনে নিয়ে যায় তার কাছে, মিলন হয় জৈবিক নিয়মে। ফলশ্রুতি নতুনতর বংশধর।

যে প্রকৃতির সঙ্গে তার আরণ্য জীবনে নিবিড় পরিচয় তাদের আচার আচরণকে অনুকরণ, অনুসরণ করেছে, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। যে মানবেতর প্রাণী তাকে বিভিন্নভাবে, এমন কি খাদ্য হয়েও তাকে সাহায্য করেছে, তাকেই সে দেবচর্চার প্রথম স্তরে দেবতার আসনে বসিয়েছে, পশ্বাচারকেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেবপূজার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছে। যেহেতু নিজেই জীবনযাত্রার উন্নততর পথ সে দেখতে পায়নি, তাই পশ্বাচারকে জীবনে এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলে গ্রহণ করলে দৈহিক অথবা মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক চিন্তা সে করেনি, করা সম্ভবও ছিল না।

একবার কোনো একটি বিশেষ ধ্যান-ধারণায় বহুকাল ধরে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা সহজে মন থেকে সরে যায় না। তাই যদি না হবে তবে আজও কেন আমরা পাঠ্য গ্রন্থে লিখি, শিশুকে শেখাই এবং লেখাই 'সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়'। The sun rises in the east and sets in the west'। এই উক্তি তখনই সত্য ছিল যখন মানুষের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিল পৃথিবী স্থির এবং সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণরত। বহুদিন হয়ে গেল বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এর বিপরীত কথা। তবু লিখি, শেখাই, অবচেতনে ভাবি, ভাবাই—সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে।

যে ঋতুরক্তঃ মিলন তথা বংশবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ সংকেত, দেববাদের প্রাথমিক স্তরে তাকেই আনা হলো পূজায়, বিভিন্ন কল্যাণমূলক চিন্তায়। সৃষ্টির ধারণী শক্তি নারীতেই আছে—এই বোধের অধিকারী হলো যেদিন মানুষ সেইদিনও

তার চিন্তার জগতে পরিবর্তন এলো না; কারণ সে প্রত্যক্ষ করলো নারীত্বের উদ্বোধনকালের সংকেতও সেই ঋতুশোণিত। কুমারীর সঙ্গে কুমারী-শোণিতও সমান শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সাধারণ মানুষের শিকারী-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান কুক্ষিগত হলো পৌরোহিত্যের অর্থাৎ বুদ্ধিমান শ্রেণীর। সুপরিকল্পিত বিধিবিধানের কাঠামোতে তখন দেবপূজার রীতিনীতি নির্দিষ্ট হলো। কিন্তু নির্দেশও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যুগে যুগে বদলায়। অন্যদিকে এর জন্য দায়ী অনেক সময় মানুষের স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও ভুল ব্যাখ্যা। এইসব এবং অন্যান্য বহুতর কারণে মানুষ ভুলে গেল ঋতুরজের প্রকৃত তাৎপর্য এবং গুরুত্বটিকে। যেহেতু কুমারী তথা নারী পূজাচিন্তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং এককালে 'তারই রজঃ' (ঋতুরজঃ) গুরুত্ব ছিল, [এখন বিস্মৃত হলেও]—এই চিন্তা থেকেই কুমারীর কর্ণচ্ছেদন এলো (মূলে ছিল সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কুমারীচ্ছদের ছেদন বা ভেদন)।

মানুষের সম্পদচিন্তা পশুপালন স্তরেই যখন ধীরে ধীরে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিমুখী হয়ে উঠলো তখন তারই সূত্র ধরে এলো দাসপ্রথা, ভূ-সম্পদের যুগে এলো সামন্ততন্ত্র। এই নির্দিষ্ট যুগেই দেবপূজাও পুরোহিত-সামন্ত রাজন্যের অনুশাসনে আরও বেশি রূপায়িত হলো। বহুতর সৈন্য চাই, চাই পুরুষ সন্তান, এই চিন্তার সঙ্গে নারীকে ভোগের সামগ্রী করে তোলার চিন্তাও যুগপৎ কাজ করলো। দেবতার নামে, দেব-আরাধনার নামে নারীর জীবনে নেমে এলো নতুনতর অভিশাপ। সে হয়ে গেল দেবদাসী, হলো বারবণিতা। যদিও এই বৃত্তির পেছনে আরও বিচিত্র চিন্তা কাজ করেছে পৌরোহিত্যের অনুশাসনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে)। যে নারী মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সহায়ক, সে কিন্তু তার নারীত্ব তথা মনুষ্যত্বের উপযুক্ত এবং স্বাভাবিক মর্যাদা পেলো না। এখানেই শেষ নয়, যে কুমারীর মধ্যে দেবীত্ব আরোপ করে দেবী কল্পনা গড়ে তোলা হলো সেই দেবীরাও রেহাই পেলেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাতৃকাদেবীরাও 'বারবণিতা' বিশেষণ পেয়ে গেলেন। কেন?

প্রাচীন গ্রীসসহ বিভিন্ন দেবতা-মন্দিরে যেমন থাকে দেবদাসী, তেমনি দেখা যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই মন্দিরগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সামাজিক সমস্যার পতিতালয়সমূহ।

একটা কথা বার বার মনের কোণে উঁকি দেয়—তা হলো পৌরোহিত্যের নিরলস সাধনা একদিকে আদিম পূজাপদ্ধতির রেখাচিত্র অঙ্কন করেছিল, তেমন সে তো

পরিশীলনের বিভিন্ন পন্থারও নির্দেশক ! তা না হলে পূজায়, দেব-কল্পনায় নতুন নতুন দিক এলো কেমন করে ? আদি পশু-দেবতারা মনুষ্য মূর্তির দেবতায় কেমন করে রূপান্তর পরিগ্রহ করলেন ? কেমন করেই বা সাকার থেকে নিরাকার উপাসনায় দৈহিক থেকে মানসিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন এলো ?

তবু প্রশ্ন জাগে যে পূজা চিন্তার, দেববাদের উদ্ভব মানুষের শিকারমূলক অর্থনৈতিক পটভূমিতে, তার মৌলিক পরিবর্তন কেন ঘটলো না যখন শিকার পশুপালন-কৃষিমূলক অর্থনীতির যুগ অতিক্রম করে মানুষ যন্ত্রশিল্পের অর্থনীতির যুগে এসে পৌঁছেছে ! আজও এদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের মতই কৃষিনির্ভর। তবু কৃষিনির্ভর দেবকল্পনা কেন এলো না ? কেনই প্রাক-কৃষিযুগের দেব-দেবীরাই নতুন অর্ঘ্যে পূজিত হচ্ছেন ? একি পৌরোহিত্যের চিন্তার জগতে দৈন্যের বহিঃপ্রকাশ, নাকি দেবপূজা, দেবার্চনাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীস্বার্থের যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তা থেকে সরে না যাবার সুপরিকল্পিত চিন্তা এবং সেই সঙ্গে ধর্মের নামে, দেবচিন্তার নামে সাধারণ মানুষকে সমাজ-সমস্যার বহুতর বাস্তব চিন্তা থেকে এবং তাদের সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের মতো প্রয়োজনীয় দিক দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা ? একারণেই কি দৈনন্দিন সমস্যায় তাড়িত ভক্তবৃন্দের মামলায় জয়, শত্রু বিনাশ, পরীক্ষায় পাশ, একটা ভাল চাকুরীর প্রার্থনা, মনোমত পতি লাভ, বন্ধ্যাত্ব ঘুচানো, সন্তানের রোগমুক্তির প্রার্থনাই পূজাশেষে দেবতাকে বেশি করে শুনতে হয় ?

যে কথা বলছিলাম, সেই সুদূর অতীতেই পূজার নামে, দেব-আরাধনার নামে ঢুকতে থাকলো অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ। কি এদেশে, কি বিদেশে, বিভিন্ন কামনা-বাসনা পূরণের জন্য নিষ্পাপ বালক-বালিকা, কুমার-কুমারী, তরুণ-তরুণী, নর-নারী পশুবলির মতই বলি হতে থাকলো। ধর্ম-চিন্তা এই ধরণের অসামাজিক নৃশংস কর্মে পরোক্ষভাবে মানুষকে প্ররোচিত করে গার্হস্থ্য তথা সামাজিক জীবনে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। বিত্তশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থতার আকাঙ্ক্ষাও যে এক্ষেত্রে কাজ করে তার প্রমাণ ত্রিম্বকের ঘটনা, প্রমাণ জাতকের কাহিনীতে গণ-রাজহত্যার চিত্র।

সমস্যা আজ-ও আমাদের নারীসমাজকে নিয়ে। সামাজিক ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার নামে আজ-ও অল্পবয়সে বিবাহ এদেশের সাধারণ রীতি। ফলে, মূলত গ্রামাঞ্চলে এখনও কিশোরী-মাতাকে ভগ্নস্বাস্থ্য হতে হয়। একদিকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপনে বাধ্য, তখন আকৈশোর বহুসন্তান ধারণ নারীসমাজকে কোন পথে ঠেলে দিচ্ছে তা সহজেই চোখে পড়ে পথে-ঘাটে।

আরও মজার ব্যাপার হলো, জনসমস্যা সমাধানের জন্য যখন রাষ্ট্র এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছে, ঠিক তখনও এদেশের মন্দিরে মন্দিরে, দেবতা বা পীর-ফকীরের থানে, বিভিন্ন লোক-বিশ্বাস এবং লোকাচারে চলেছে প্রজনন-কেন্দ্রিক উৎসব। পূজা-হোম-মাদুলি-মন্ত্র ঝাড়-ফুঁক তুক্-তাকের ছড়াছড়ি। মূলত জীবিকার তাগিদে, প্রাচীন ঐতিহ্যের সংস্কারের বশবর্তী হয়ে আজও যে প্রথাকে লালন করে চলেছে পৌরোহিত্য, তা যে প্রাচীন যুগের বধ্যভূমিতে নিজেরই ক্রুশকাঠ নিজেকেই বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত ব্যাপার তা সম্ভবত আমরা বুঝতে পারছিনা। পুরোহিত-তন্ত্রের এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানগুলি আমাদের কোন কোন পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সংস্কারাচ্ছন্ন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সেদিকে সচেতন করে দেবার সময় কি আজও আসেনি ?

দেহজাত আদিরসের সাহায্যে সাধনা বিভিন্নগোষ্ঠীর তন্ত্রসাধনা নামে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই সাধনপদ্ধতি সৃষ্টির বহু আগেই, জীবসৃষ্টির জৈব প্রেরণাই কি এদেশে, কি বিদেশে এই ধরণের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটেছিল—এর প্রমাণ আগেই দেবার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন.—পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে, জনসমস্যাজর্জর পৃথিবীতে তন্ত্র-সাধনার মত অনুষ্ঠানগুলি মানুষের কি কাজে লাগবে ? তা ছাড়া এই সাধনপদ্ধতির যে বিভিন্ন দিক আছে, প্রকৃত সৃষ্টি-রহস্যকে জানবার ক্ষেত্রে তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি ? সাধক যা জানেন তা মূলত তাঁর অনুভূতি বা উপলব্ধিজাত (subjective feeling)। এতে বস্তুনিষ্ঠ (objective) কোনো জ্ঞান হয় না, যা থেকে সৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা যায়। তাই বর্তমান সমাজজীবনে এই ধরণের সাধনার কোনো বাস্তব উপযোগিতা আছে কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। তা ছাড়া, এই সাধন-পদ্ধতিতে নর এবং নারীর মধ্যে প্রকৃত 'সামরস্যের-ভাব' আনা কি সম্ভব সমাজজীবনে ? তা যদি সম্ভব হতো তবে আজও নর ও নারীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈষম্যের দৃষ্টিভঙ্গি দেখি কেন ?

যে সাধনা বৃহত্তর সমাজজীবনের কল্যাণকে আনতে পারে তা-ই সমাজের পক্ষে গ্রহণীয়। সেই পথে যে সাধনা আলোকবর্তিকা দেখাতে পারবে তারই পথ চেয়ে আছে সমাজ, বৃহত্তর পৃথিবীর মানুষ।

তবু বলবো, কুমারীপূজা ছিল, আছে, থাকবে,—থাকা উচিত। তবে পদ্ধতির আমূল সংস্কারসাধন করতে হবে। এক সময় গোষ্ঠীবৃদ্ধির চিন্তা যখন প্রবল ছিল তখন না হয় 'গৌরীদান' সমাজ মেনে নিয়েছিল ; কুমারীমনও ঐতিহ্যগত সামাজিক

শিক্ষায় নিজেদের তৈরি করে নিত। আজ এই মানসিকতা পরিবর্তনের ব্যাপক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আশু কর্তব্য। এর জন্য চাই ব্যাপক গণশিক্ষার প্রসার। দ্বিতীয়ত, কন্যার যৌবন-লক্ষণকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের জনজীবনে ব্যাপক সংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা কাজ করে চলেছে আজও। এই লক্ষণের সূচনাকে কেন্দ্র করে এমন কতগুলি ধ্যান-ধারণা নবযুবতীর মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে সমস্ত জীবন ধরে সেইসব কেন্দ্র করে নারীমনে কতগুলি সংস্কার কাজ করে চলে। ফলশ্রুতিতে নারীর ব্যক্তি-জীবন এবং পারিবারিক-জীবনের উপর সুস্থ প্রভাব অনেক সময়ই পড়ে না (মনে রাখা দরকার যে এই মন্তব্য সেই জনজীবনকে কেন্দ্র করে, যাদের আচার আচরণ, ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ প্রায় কিছুই খবর রাখেন না)। তৃতীয়ত, বাল্যেই হোক, আর পরিণত বয়সেই হোক বিবাহ তো কেবল পিতামাতাকে 'পুন্নামক' নরক থেকে ত্রাণের উদ্দেশ্য নয় (পুত্র শব্দের অর্থ—যার জন্মগ্রহণে পুৎ-নরক থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যার জন্মে বংশ পবিত্র হয়)। পুত্র বা কন্যার জন্মে, তাদের উপযুক্ত ভরণ পোষণ এবং শিক্ষার অভাবে ইহজীবন তথা সমাজই যে প্রতিদিন নরক হয়ে উঠতে পারে সেদিকে কি নজর দেবার প্রয়োজন নেই? (দারিদ্র্য পীড়িত এই দেশে আজও যে জীবনে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নরকগামী হবার চিন্তা কাজ করেছে, সেখানে তাদের অভিজ্ঞতা, যত বেশী সন্তান হবে তত আয়ের পথ প্রশস্ত হবে)। কাজেই বিবাহিত জীবনের পরিণতিতে সন্তানকে সার্থকভাবে শিক্ষিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার শিক্ষাও হবে কুমারীপূজার অঙ্গ। এক কথায়, ঋতুরজঃ সম্পর্কিত ভীতিমূলক সংস্কার, ভাবী সন্তানের গুরুদায়িত্ব, নিজের স্বাস্থ্য—এগুলি সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব যে মেয়েদের সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে কতখানি অন্তরায় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে কতখানি সবল মানসিকতা আশা করতে পারি? আচারে-আচরণে, ধর্মীয়-চিন্তায় এবং কর্মে সংস্কারের বেড়াজাল যদি চারপাশ থেকে নারীসমাজকে আটকে রাখে তবে বলিষ্ঠ কুমারীত্ব-নারীত্ব-মাতৃত্ব আশা করবো কি করে?

যে কথা বলতে চাই তা কিন্তু মুষ্টিমেয় সাক্ষর বা শিক্ষিত মহিলার দিকে চেয়ে নয়। বৃহত্তর ভারতের যে বিপুল সংখ্যক গ্রাম আছে সেখানে, এমন কি শহরাঞ্চলের নারীসমাজের, তাদের অভিভাবকদের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার পরিবর্তন না হলে কেবল 'নারীবর্ষ' পালনে কোনো ফল হবে না।

আরও একটা কথা বলা দরকার নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে। আমাদের রাষ্ট্রীয় বিধানের

নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। সেই স্বীকৃতিকে সামনে রেখেই শিক্ষা-ব্যবস্থার যে বিন্যাস তাতে বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীরা একই ধরণের শিক্ষা পায় বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে।

কিন্তু শৈশবাবধি যে শিক্ষা গৃহ তথা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকেন্দ্রিক সেখানে কিন্তু শিক্ষার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আবাল্য একটি পুংশিশু শুনে আসে তাকে বড হয়ে দশজনের একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। অন্য দিকে একটি বালিকাকে প্রতি মুহূর্তে শুনতে হয়, শ্বশুর ঘরে গিয়ে তাকে আদর্শ কুলবধূ হয়ে সবার মন জয় করতে হবে। তা না পারলে তার নারী-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পাওয়া ভার। তা ছাড়া পারিবারিক-জীবনে নেমে আসবে অশান্তি। অর্থাৎ, পরিবারকেন্দ্রিক যে মৌলিক শিক্ষা সেখানেই নারী-পুরুষের মানসিকত গঠনে ব্যবধান সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। এই ব্যবধানীকৃত মানসিকতার উপরো রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে প্রচলিত শিক্ষা মৌলিক পরিবর্তন তেমন ঘটাতে পারে না বলেই উচ্চ শিক্ষিত নারী-পুরুষের মধ্যেও জীবনদৃষ্টির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় অনেক সময়।

তাই আমাদের বক্তব্য পারিবারিক শিক্ষা-কাঠামোতে কন্যাসম্পর্কিত দৃষ্টি-কোণের পরিবর্তন আশু প্রয়োজন।

লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে, গ্রামীণ গণমাধ্যমগুলিকে উপযুক্ত এবং সার্থক-ভাবে ব্যবহার করে ব্যাপক কার্যসূচি হাতে নিয়ে যদি অগ্রসর না হওয়া যায় তবে অশিক্ষা কুশিক্ষা এবং অর্থহীন সংস্কারের হাত থেকে নারী তথা বৃহত্তর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রকৃত এবং সার্থক কুমারীপূজাও সেক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার পথ থেকে সরে সুস্থ সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে কুমারীর সহজাত সম্ভাবনার পূর্ণবিকাশের পথ নির্দেশই হোক এ যুগের 'কুমারীপূজা'। পশুবলির মতই বন্ধ হোক তাঁদের মানস-বলির ঐতিহ্য। নারীত্বের যুগ-সঞ্চিত অপমানের কলঙ্ক থেকে মুক্ত হোক মানব-সমাজ।